দি নেকেড ফেস

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

অফুরান উৎসব.....2

প্রথম রোগী.....76

টেলিফোন অপারেটরের ফোন.....132

সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা.....168

অফুরান উৎসব

০১.

সকাল এগারোটা বাজতে দশ।

সারা আকাশ জুঠে হঠাৎ শুরু হয়ে গেছে অফুরান উৎসব। ধবধবে সাদা তুষারের কণা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে সমস্ত শহরের ওপর। রাস্তাগুলো ইতিমধ্যেই বরফ ঢাকা, নতুন করে এই তুষার-বৃষ্টি সে সহ্য করতে পারবে কি? ডিসেম্বরের হু-হুঁ শীতল ঠান্ডা হাওয়া। বড়োদিন উপলক্ষে যারা কেনাকাটা করতে এসেছে, তারা ছুটতে লাগেল।

লেক্সিংটন এভিনিউ। হলুদ বর্ষাতি গায়ে লম্বা রোগা লোকটা নিজস্ব ছন্দে হেঁটে চলেছে। জোরেই হাঁটছিল সে। ঠান্ডা এড়িয়ে এখুনি তাকে ঘরে নিশ্চিত নিরাপত্তায় ফিরতে হবে। লোকটা আনমনা, অনেকের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে তার, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মনে একটাই চিন্তা-মেরির কাছে কত তাড়াতাড়ি খবরটা পৌঁছে দেবে সে।

অতীত মুছে গেছে। এতদিন রুদ্ধকারার অন্তরালে দিন কেটেছে একাকীত্বের যন্ত্রণায়। এখন সে পাখির মতো মুক্ত। নতুন করে জীবনটাকে আবার গড়ে তুলবে।

চোখ বন্ধ করে একবার ভাবরার চেষ্টা করল। এই খবরটা শুনে মেরির মুখের অবস্থা কী রকম হবে? উনষাট নম্বর স্ট্রিটের মুখে নিষেধের লাল আলোটা জ্বলে উঠল। অধৈর্য পথচারীদের পাশাপাশি থমকে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হল সে। একটু দূরে সান্তাক্লজের

মূর্তি। ভাগ্যদেবতার উদ্দেশ্যে কিছু পয়সা প্রণামী দিতে হবে। অভ্যাসবশত ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল সে। আর তখনই তার পিঠে কে যেন চাপড় মারল। চমকে উঠল সে। ভাবল, হয়তো কোনো মাতালের কাণ্ড।

কিন্তু কে মারল? বিস্ময়ের সঙ্গে ও লক্ষ্য করল, ওর হাঁটু দুটো যেন ভেঙে পড়েছে। নিজের দেহটা পথের ওপর আছড়ে পড়ছে। আচমকা আঘাতটা লেগেছে। সমস্ত শরীরে সেটা ছড়িয়ে পড়ছে। মুখের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া জুতোর মিছিল দেখতে পাচ্ছিল সে। হিমঠান্ডা ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা শরীরটা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। বুঝতে পারল সে, এই জায়গাটায় শুয়ে থাকা উচিত নয়। একটা আর্ত চিৎকার বের করার চেষ্টা করল। রক্তধারা মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ধারাটা এগিয়ে গেল নর্দমার দিকে। যন্ত্রণাটা দুঃসহ। তবুও সে পরোয়া করল না। ওই শুভ সংবাদটার কথা আরও একবার মনে পড়ে গেল তার। এখন সে মুক্ত! মুক্তির খবর মেরির কানে পৌঁছে দিতে হবে। আকাশে চোখ ধাঁধানো সূর্য। চোখ দুটো বন্ধ করল সে। তুষারকণা আরও জোরে আক্রমণ করতে শুরু করেছে তাকে। ভাগ্যিস একটু বাদে সে হারিয়ে গেল অবচেতনার অন্ধকারে, তা না হলে ...

.

০২.

অভ্যর্থনা কক্ষের দরজা খোলা। ক্যারল রবার্টস বসে আছে। দরজা বন্ধ করার শব্দ পেল সে। পায়ের আওয়াজও। উদ্দেশ্যটা কী? অনুমান করতে পারে সে। ওরা দুজন। চল্লিশ

ছাপিয়ে গেছে একজনের বয়স, বিশাল চেহারা, লম্বায় ছু-ফুটের বেশি হবে। নিমেদ শরীর, ইস্পাতের মতো পেশী, মাথাটা প্রকাণ্ড। কৌতুকহীন একজোড়া নীল চোখ। দ্বিতীয় লোকটার বয়স কম। মনে হয় ভোলামেলা প্রকৃতির। চোখদুটি ধূসর। চাউনিতে সতর্কতার ছাপ আছে। দুটো লোকের চেহারা একদম আলাদা। তবুও ক্যারলের মনে হল ওরা বোধহয় একই মায়ের পেটের দুই যমজ ছেলে।

ওরা দুজন পুলিশের লোক। ক্যারলের অনুভূতি এই খবরটা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে মাথার ভেতর। এটাই ক্যারলের সবথেকে বড়ড়া গুণ, যে কোনো লোককে দেখে সে পেশা বুঝতে পারে।

ওরা টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘাম গড়াতে শুরু করেছে। কী হল? চিক? কোনো গন্ডগোল নাকি? কিন্তু ছমাসে ও পথ মাড়ায়নি, নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সেদিন চিক সব কিছু ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে? স্যামির কিছু হয়েছে কি? তা কেমন করে সম্ভব? বিমানবাহিনীর কাজে স্যামি তো এখন বিদেশে? দাদার যদি কিছু হয়ে থাকে? তাহলে পুলিশের লোক আসবে কেন?

নাঃ, ঠিক ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এখন ক্যারল হারলেমের বেশ্যা নয়। তার গায়ে কেউ ধাক্কা মারতে পারবে না। ওর পরিচয় আজ বিরাট। কিন্তু? আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে কেন?

মনের মধ্যে এত তোলপাড়, মুখে সেটা ফুটিয়ে তোলেনি সে। নিখুঁত ছাঁদের পশমী পোশাক পরা এক বাদামী চামড়ার নিগ্রো তরুণী টেবিলের পেছনে বসে আছে। দেখে

মনে হয় আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে। এক নজরে এর বেশি কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। স্থির অকম্পিত গলায় ক্যারল প্রশ্ন তুলল–বলুন?

লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি ভালোভাবে তাকাল ক্যারলের দিকে। চোখ হঠাৎ আটকে গেল বগলের নীচে জামার ঘামে ভেজা অংশটাতে। তার মানে মেয়েটা ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন? ডাক্তারের রিসেপসনিস্ট, ঘাবড়াবার কারণ কী? পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল। পিন দিয়ে গাঁথা চামড়ার পরিচয় পত্র।

ওয়ালেটটা ক্যারলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল–আমি লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি। উনিশ নম্বর থানা থেকে আসছি। আর এ হল ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি। আমরা দুজনেই হোমিসাইড ডিভিশনের।

তার মানে? ক্যারলের মুখ কুঁচকে গেছে। মনের ভাব সে আর আটকে রাখতে পারছে না। রাখা সম্ভব নয়। চিক কাউকে খুন করেছে? ডাকাতি করতে গিয়ে মারামারি? নাকি নিজেই গুলি খেয়ে মরে গেছে? অনেকগুলো সম্ভবনা। কোনটা সঠিক, কে জানে?

ঘামের দাগটা ছড়াতে শুরু করেছে। ক্যারল সজাগ হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারছে সে। এটা ম্যাকগ্রেভির নজর এড়ায়নি।

কমবয়সী গোয়েন্দাটি বলল–আমরা ডাঃ জুড স্টিভেন্সের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরোল ক্যারলের বুক থেকে। যাক বাবা, চিক বা স্যামির ব্যাপার নয়। কোনো রকমে সে বলল, মাফ করবেন, ওনার কাছে এখন পেশেন্ট আছে।

ম্যাকগ্রেভি বলল–আমরা বেশি সময় নেব না। আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নগুলো এখানেও করা যেতে পারে, অথবা ইচ্ছে হলে উনি আমাদের হেড কোয়ার্টারে আসতে পারেন।

ক্যারল এবার আবার অবাক হয়েছে। নরহত্যা বিভাগের সঙ্গে ডাঃ স্টিভেন্সের কী দরকার? ডাঃ জুড কোনো অন্যায় করেন নি, তাহলে? তাকে কেন জবাবদিহি করতে হবে। চার বছর ধরে ক্যারল এখানে কাজ করছে। ডাঃ জুডের চরিত্র সম্পর্কে সে অনেকের থেকে ভালো খবর রাখে।

সূত্রপাত হয়েছিল কোথায়? আদালত কক্ষে...।

তখন রাত তিনটে। আদালত কক্ষের মাথার ওপর আলোগুলো বিবর্ণ দ্যুতিতে জ্বলছে। ঘরটা একেবারেই পুরোনো। বিরক্তির ছাপ চারদিকে। আতঙ্কের বাসি গন্ধ বাতাসকে ভরপুর করেছে। দেয়ালের গায়ে নোংরা জমতে জমতে পুরু আস্তরণ পড়েছে।

ক্যারলের বরাত দোষ, জজসাহেব মারফিককেই আবার দেখা গেল বিচারকের আসনে বসে থাকতে। দুসপ্তাহ আগে ক্যারল ওর বিচারে ছাড়া পেয়েছিল। সেটা ছিল ক্যারলের প্রথম অপরাধ অর্থাৎ বেজন্মাগুলো সেবারই প্রথম ক্যারলকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। এবার আর রেহাই নেই। ক্যারল জানে, জজ মারফিক তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলবে।

মকদ্দমার সময় এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লম্বা শান্ত চেহারার একজন লোককে সামনে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। লোকটা জজসাহেবের সঙ্গে নীচু স্বরে কথা বলছে।

হাতকড়া পরা অবস্থায় একটা মোটাসোটা কালো লোক অনবরত কেঁদে চলেছে। শান্ত লোকটা তার হয়ে সালিশি জানাচ্ছে। ক্যারল বুঝতে পারল। ক্যারল একা, ওর হয়ে লড়াই করবে কে?

লোকটা সরে গেল। এবার ক্যারলের নাম ডাকা হল। কাঁপুনি এড়াতে হাঁটু দুটোকে জুড়ে রাখল সে। আদালতের কেরানী জজসাহেবের দিকে অভিযোগ পত্রটি এগিয়ে দিল।

ক্যারলের দিকে তাকিয়ে জজ মারফিক তার সামনে রাখা কাগজটার ওপর চোখ রাখলেন।

–ক্যারল রবার্টস, রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করা এবং মরিজুয়ানাসহ ধৃত হওয়া, তাই তো?

গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-হৈ হয়েছিল। পুলিশের লোকটা সামান্য ঠেলা দিয়েছিল। রেগে গিয়ে ক্যারল তার অণ্ডকোষে লাথি চালায়। হাজার হোক ও একজন আমেরিকান নাগরিক। বিনা অনুমতিতে ওর গায়ে হাত দেওয়া হবে কেন?

–কয়েক সপ্তাহ আগে আপনি এখানে এসেছেন, তাই না মিস ক্যারল? বিচারক অন্তর্ভেদী চাউনিতে ক্যারলকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে জানতে চাইলেন। ক্যারল আমতা আমতা করে জবাব দিল–হ্যাঁ স্যার।

–আমি এর আগে একবার প্রমাণের অভাবে আপনাকে মুক্তি দিয়েছিলাম?

–হ্যাঁ।

–আপনার বয়স।

–আজই ষোলো বছর পূর্ণ হল। আজ আমার শুভ জন্মদিন।

কথা বলতে বলতে ক্যারল হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল। থরথর করে কাঁপতে থাকল ওর পাতলা শরীর।

লম্বা শান্ত চেহারার লোকটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। চামড়ার অ্যাটাচিতে সে কীসব কাগজপত্র ভরে নিচ্ছিল। ক্যারলকে কাঁদতে দেখে সে বিচারকের আসনের দিকে এগিয়ে গেল।

জজ মারফিক বিরতি ঘোষণা করলেন। লোকটিকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন। পনেরো মিনিট কেটে গেল। ক্যারল দেখল, লোকটি অন্তরঙ্গভাবে জজসাহেবের সঙ্গে কথা বলছে।

জজসাহেব বললেন–আপনার ভাগ্য তো ভালো মিস ক্যারল। আপনি আর একটা সুযোগ পেতে চলেছেন। আরও তদন্তের জন্য কোর্ট আপনাকে ডাঃ স্টিভেন্সের ব্যক্তিগত হেফাজতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

লোকটা তাহলে একজন হাতুরে ডাক্তার? ক্যারল মনে মনে ভাবছিল। যাইহোক তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। ষোলো বছরের জন্মদিন ওর নয়, এ কথাটা ওরা জেনে ফেলার আগেই এই কোর্ট চত্বর থেকে ওকে পালাতে হবে।

ডাঃ জুড স্টিভেন্স নিজের গাড়িতে করে ক্যারলকে ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। একাত্তর নম্বর স্ট্রিটে। ইস্ট রিভারের সামনাসামনি ফ্ল্যাট বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজানো। সদরের সামনে দারোয়ান আর লিফট চালক ডাক্তারকে অভিবাদন জানালেন। রাত তিনটের সময় একটি কালো চামড়ার মেয়েছেলেকে নিয়ে ডাক্তার ঢুকছেন অথচ কারও কোনো ভূক্ষেপ নেই। তার মানে? তার মানে স্টিভেন্স বোধহয় এমন কাজ অনেক দিন ধরেই করছেন।

এত সুন্দর ফ্ল্যাটে ক্যারল কোনেদিন ঢোকেনি। ড্রয়িং রুমটা সাদা ধবধবে রং করা। দুটি নীচু সোফা। মাঝখানে একটা পুরু কঁচ বসানো টেবিল। দাবার ছক সাজানো আছে। চারপাশের দেওয়ালে ঝুলছে আধুনিক তৈলচিত্র। একধারে ছোটো একটা টেলিভিশন। তার থেকে লবির চত্বর দেখা যাচ্ছে। বার কাউন্টার রয়েছে এককোণে, তার পাশে সারি সারি গ্লাস আর কারুকাজ করা সুরা পাত্র।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে ক্যারলের চোখে পড়ল নদীর বুখে ভাসমান নৌকোর । সারি। আঃ, মন কেড়ে নেওয়া ছবি।

জুড বললেন–কোর্টে গেলেই আমার খিদে পায়, কিন্তু জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্টা একটা পার্টি হলে কেমন হয়।

ক্যারল রান্না ঘরে ঢুকল। মেক্সিকানদের ওমলেট, ফরাসিদের ভাজা আলু, ইংরেজদের নরম আঁঝরা কেক, চাটনি, সেই সঙ্গে কফি।

ভদ্রলোক বললেন–অবিবাহিত থাকার এই সুযোগ, যখন ইচ্ছে রান্না করা যায়।

তাহলে? লোকটা বিয়ে করেনি, ঠিকে কাজের লোকই নেই। ক্যারল মনে মনে হাসল। লোকটাকে ঠিক মতো খেলাতে পারলে অনেক লাভ হবে। পরিপাটি করে রান্না শেষ হল। জুড ক্যারলকে নিয়ে শোবার ঘরে এলেন। এঘরের দেওয়ালের রঙ নীল। বিরাট জোড়া খাটে যে চাদর তাতেও ডোরা কাটা নীল রং। একটা স্প্যানিশ ড্রেসিং টেবিল রয়েছে। কালচে কাঠের তৈরি। পেতলের কারুকাজ করা।

ভদ্রলোক বললেন–রাতটা আপনি এখানেই কাটিয়ে দিতে পারেন। একটা পাজামা আমি দিয়ে যাচ্ছি।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ক্যারল। খুশিতে শিস দেবার ইচ্ছে হল তার। অনেক দিন বাদে একটা ভালো জ্যাকপটের বাজি ধরেছে সে। চোখ বন্ধ করে লোকটার মুখখানা ভাববার চেষ্টা করল। লোকটা কী চাইছে? ওর অনেক দিনের ইচ্ছে একটা মাদী জেল ঘুঘুর কালো পাছা দেখবে। ওর ইচ্ছেটা আমিই শেষ পর্যন্ত পূরণ করব।

ধারাস্নানের কলের নীচে আধঘন্টা নগ্নিকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যারল। স্নান সেরে করে তার যৌবনোচ্ছুল দেহটার ওপর তোয়ালে জড়াল। বাইরে এল, দেখল বিছানার ওপর একটা পাজামা রাখা। আপন মনে হেসে উঠল সে। একটানে তোয়ালেটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় হেঁটে গেল বৈঠকখানার দিকে। সেখানে কেউ ছিল না। আরও এগিয়ে গেল সে। পাশের ছোট্ট ঘরটায় উঁকি দিল। বিরাট একটা টেবিলের পেছনে লোকটাকে দেখা গেল। ঘরটা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বইতে ঠাসা। মুচকি হাসি হেসে ক্যারল পা টিপে টিপে জুডের পেছনে এসে দাঁড়াল। ঘাড়ে আলতো একটা চুমু খেল। ফিসফিস করে বলল–এসো না, আমি তো আর থাকতে পারছি না।

জুডের মাথাটা ওর কবোষ্ণ বুকে ঠেসে ধরল।

জুড ওর এই আচরণে অবাক হয়ে গেছে।

ক্যারল আবার আদুরে কণ্ঠস্বরে বলল–আমরা দেরী করছি কেন?

জুড কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করলেন। ক্যারলের নগ্নিকা দেহের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন–এতেও কি তোমার শিক্ষা হয়নি? নিগ্রো হয়ে জন্মানোর জন্যে তুমি নিশ্চয়ই দায়ী নও। মাত্র ষোলো বছর বয়সে বেশ্যা বৃত্তি করার ইচ্ছেটা কে মাথায় দিল?

ক্যারল হাত ছাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি সরে দাঁড়াল। ভুলটা কোথায় হয়েছে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। শোয়ানোর আগে হারামজাদাটা কোনো নতুন খেলা খেলতে চাইছে। নাকি? দেখাই যাক, আরও একবার চেষ্টা করে।

জুডের দু-পায়ের সন্ধিস্থলে হাতটা এগিয়ে নিয়ে গেল ক্যারল। মৃদু একটা টোকা দিয়ে বলল–অনেক হয়েছে, এবার দেখি তুমি কেমন আমাকে সুখ দিতে পার।

জুড ক্যারলকে আলতো হাতে সরিয়ে দিলেন। পাশের একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলেন। এর আগে কোনো পুরুষ মানুষের এমন আচরণ কখনও দেখেনি ক্যারল। লোকটা কী? লোকটা কি মর্তকামী? নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যারল বলল–তোমার মতলবটা কী; কেমন করে পেতে চাইছ আমাকে?

–বেশ আলোচনা শুরু হোক তাহলে।

কথা শুরু হল। সমস্ত রাত্রি ধরে চলল আলোচনা। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একের পর এক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ডাঃ স্টিভেন্স খুঁটিনাটি অনেক কিছু জেনে নিলেন। ভিয়েতনাম আর ইহুদি কলেজে দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষয়ে ক্যারলের মতবাদ শুনলেন তিনি। যখন-তখন এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী? ডাঃ স্টিভেন্স কী চাইছেন? তিনি কি তার এই কাজে সফল হয়েছেন?

সে রাতে হঠাৎ একসময় ক্যারল বুঝতে পারল, সে একদম নগ্নিকা। পাজামা গলিয়ে ফিরে এল সে। বিছানার ধারে বসে আরও অনেক কথা হল। এতদিন পর্যন্ত যেসব কথাগুলো

ওর মনের ভেতর জমা ছিল, সব হুড়হুড়িয়ে বেরিয়ে এল। অবচেতন মনের গভীরে যেসব স্মৃতি, তাদের রোমন্থন। তারপর? আঃ, ঘুম, নিশ্চিত নিদ্রার আমন্ত্রণ, তখন হালকা লাগছিল শরীরটাকে। মনে হয়েছিল তার, বিরাট একটা অপারেশনের পর শরীর থেকে সব বিষ বোধহয় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকালে ব্রেকফাস্টের পর ডাঃ জুড স্টিভেন্স ক্যারলের হাতে একশো ডলারের নোট এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্যারল ইতস্তত করে বলেছিল কাল আমি মিথ্যে বলেছিলাম, আমার জন্মদিন ছিল না।

জুড হেসেছিলেন–ভয় নেই। জজসাহেবকে একথাটা জানাতে যাচ্ছি না।

তারপর গলার স্বর পাল্টে বলেছিলেন–ইচ্ছে করলে টাকাটা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পার। আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, আমার একজন রিসেপশনিস্টের দরকার ছিল। আশা করি, কাজটা তুমি ভালোই করতে পারবে।

অবিশ্বাসের চোখে ক্যারল তাকিয়েছিল ফ্যালফ্যাল করে, তারপর বলেছিল–ওই কাজটা কি আমি করতে পারব? আমি শর্টহ্যান্ড বা টাইপ কোনোটাই জানি না।

–সেটা স্কুলে ভর্তি হলেই শিখে নেওয়া যায়।

–হ্যাঁ, এটা আমি ভেবে দেখিনি। তবে কাজটা খুবই এক ঘেয়ে।

সেই হল চাকরি জীবনের শুরু। দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে গেছে। সেই কাজে আজও একইরকম ভাবে কাজ করে চলেছে।

এতক্ষণ ক্যারল অতীত স্মৃতির রোমন্থনে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। এখন আবার রুঢ় বাস্তবের কঠিন ভূমিতে ফিরে এল সে। পলিশের লোক দুটো কী চাইছে? ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন?

ম্যাকগ্রেভিকে অধৈর্য মনে হল। নিথর চোখে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল–বলুন মিস।

ক্যারল শান্ত শীতল কণ্ঠস্বরে জবাব দিল–আমার ওপর হুকুম দেওয়া আছে, পেশেন্ট থাকলে আমি যেন কখনও ওনাকে বিরক্ত না করি।

দেখল তার এই কথার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তারপর ফোন তুলে ইন্টারকমের বোম টিপল, ও প্রান্তে ডাঃ স্টিভেন্সের গলা পাওয়া গেল।

ক্যারল বলল–স্যার, দুজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওনারা, হোমিসাইড ডিভিশন থেকে আসছেন।

ক্যারল ভেবেছিল, এই কথা শুনে জুড হয়তো বিচলিত হবেন অথবা ভয়ার্ত। কোনোটাই হল না।

উনি শুকনো গলায় বললেন–ওনাদের অপেক্ষা করতে হবে। বলেই লাইনটা কেটে দিলেন।

দুই আগন্তুকের দিকে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্যারল বলল–উত্তরটা আপনারা নিজের কানেই শুনলেন।

অ্যাঞ্জেলির প্রশ্ন–ওনার পেশেন্ট কতক্ষণ থাকবেন?

টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ক্যারল বলল–আরও ধরুন মিনিট পঁচিশ। উনি আজকের শেষ পেশেন্ট।

ম্যাকগ্রেভি তাকাল অ্যাঞ্জেলির চোখের দিকে। ক্যারলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করছি। চেয়ারে বসে পড়ে বলল, আপানকে কিন্তু বড় চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে।

ক্যারল বুঝতে পারল, লোকটা টোপ ফেলার চেষ্টা করছে। সে অমায়িক হাসিতে মুখ উদ্ভাস করে বলল–হতে পারে, আমার মতো আরও কত মেয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, শহরের পথে প্রান্তরে।

পঁচিশ মিনিট বাদে স্টিভেন্স তার ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ম্যাকগ্রেভিকে দেখে কেমন একটা ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তিনি বললেন–আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে কি?

ম্যাকগ্রেভি ঘাড় নাড়ে-হ্যাঁ, আমি লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি, আর উনি ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলি।

জুড অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে করমর্দন করে বললেন–ভেতরে আসুন।

মেঝেতে বিছানো একটা সুন্দর গালিচা। লেখার কোনো টেবিল নেই, কয়েকটা আরাম কেদারার মতো চেয়ার আছে। পাশে ছোটো ছোটো চৌকি। একটা দরজা দিয়ে করিডরে যাওয়া যায়, ম্যাকগ্রেভি লক্ষ্য করল। দেয়ালে ডাক্তারের কোনো ডিপ্লোমা বাঁধিয়ে রাখা নেই। অবশ্য ডাঃ স্টিভেন্স সম্পর্কে ওরা আগে থেকেই খোঁজখবর দিয়েছে। ইচ্ছে করলে ডাঃ স্টিভেন্স তার ঘরের সবকটা দেয়াল সার্টিফিকেটে ভরিয়ে রাখতে পারতেন।

অ্যাঞ্জেলি বলে উঠল–এই প্রথম আমি একজন সাইকিয়াটিস্টের চেম্বারে ঢুকলাম। আহা, আমরাও যদি আমাদের ঘরটাকে এভাবে সাজাতে পারতাম।

–আমার পেশেন্টরা এখানে এসে একটু আরাম পায়। জুডের গলায় কোনো জড়তা নেই।

-হ্যাঁ, আমি একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট।

-মাফ করবেন, অ্যাঞ্জেলি বলল–দুটোর তফাত আমার জানা নেই।

–তফাত ঘন্টায় পঞ্চাশ ডলারের।

ম্যাকগ্রেভি তাকাল জুডের দিকে। আমার সহকারীর অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি নয়। মাঝে মধ্যে উল্টোপাল্টা কথা বলে বসে। আশা করি এর জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না।

সহকারীহঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল জুডের। একটা মদের দোকানে অভিযান চালাতে গিয়েছিল ম্যাকগ্রেভির সহকারী। গুলি খেয়ে মারা যায় সে। ম্যাকগ্রেভি নিজেও আহত হয়। সেবার আমোস জিফরেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে পাগল সাব্যস্ত করে উকিল বেকসুর মুক্তির দাবী করে। তখন জুডের ডাক পড়ে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে তিনি জিফরেনকে পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাতে ধরা পড়ে জিফরেন বদ্ধ উন্মাদ। তার শরীরের কিছুটা প্যারালিসিসে আক্রান্ত। মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে জিফরেন রেহাই পেয়ে যায়। তাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়।

জুড বললেন, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। জিফরেনের মামলায় আমাদের কথা হয়েছিল। আপনার গায়ে তিনটে গুলির আঘাত ছিল। আপনার সহকারী মারা গিয়েছিলেন।

-হ্যাঁ, আপনার দৌলতে এক খুনি বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল।

জুড প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন–বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?

–আপনার কাছে কিছু তথ্যের জন্য এসেছিলাম। ম্যাকগ্রেভি অ্যাঞ্জেলির দিকে তাকাল। অ্যাঞ্জেলি হাতের প্যাকেটটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল–একটা জিনিস আপনাকে দিয়ে সনাক্ত করাব আমরা।

অ্যাঞ্জেলি প্যাকেট খুলল। হলুদ প্লাস্টিকের একটা বর্ষাতি বেরোল।

–এটা আপনি দেখেছেন ডাঃ স্টিভেন্স?

–জিনিসটা তো আমারই মনে হচ্ছে। জুডের গলায় বিস্ময়।

–আপনারই, অন্তত আপনার নাম এতে লেখা আছে।

–কোথা থেকে পেয়েছেন এটা?

–কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?

এবার আগন্তুক দুজনের মুখে লক্ষনীয় পরিবর্তন এসেছে। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই শিষ্টাচার বোধ।

ম্যাকগ্রেভির মুখের দিকে তাকিয়ে জুড পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন–পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

–আমরা রেনকোটটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে এসেছে ডাঃ স্টিভেন্স। যদি এটা আপনার হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জানতে চাই এটা কী করে হাতছাড়া হয়েছে?

ম্যাকগ্রেভি এবার স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে চাইছে।

–এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই। সকালে যখন চেম্বারের আসব বলে বেরোচ্ছি, তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি রেনকোটটা পরিষ্কার করতে দোকানে দিয়েছি বলে মাছধরার রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে দিলাম। এখানে এসে দেখি, আমার একজন পেশেন্ট রেনকোট ছাড়াই এসেছে। তখন রীতিমতো তুষারপাত শুরু হয়েছে। যাবার সময়ে তাকেই এই রেনকোটটা দিয়েছিলাম। কেন? কী হয়েছে তার?

–কার কথা বলছেন আপনি? ম্যাকগ্রেভি জানতে চাইল।

–কেন আমার পেশেন্ট জন হ্যানসেন।

–বাঃ, আপনি দেখছি নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে ফেলেছেন। শান্ত গলায় বলল অ্যাঞ্জেলি। মিঃ হ্যানসেন আর কখনও নিজের হাতে রেনকোটটা আপনাকে ফেরত দিতে পারবেন না। কারণ উনি মারা গেছেন।

কথাটা শুনে জুডের মনে হল, তারা সারা শরীরে কে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়ে আঘাত করছে। তিনি বললেন–মারা গেছেন?

–কেউ তাকে পেছন থেকে ছুরি মারে। ম্যাকগ্রেভি বলল।

জুড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ম্যাকগ্রেভি বর্ষাতিটা অ্যাঞ্জেলির হাত থেকে নিয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে ধরল, যাতে চেরা অংশটা জুডের নজরে পড়ে। কোটটার পিঠে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মেহেদি রঙা একটা ছোপলাগা। জুডের গা গুলিয়ে উঠল।

কোনোরকমে ঢোঁক গিলে জুড বললেন–ওকে কে মারল?

–সেটাই তো আপনার কাছ থেকে শুনব বলে আমরা এসেছি ডাঃ স্টিভেন্স। এই ব্যাপারটা একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট সবথেকে ভালো জানতে পারেন। আপনি এ ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন, আশা করি।

থেমে থেমে অ্যাঞ্জেলি বলল।

জুড অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে জানতে চাইলেন কখন ঘটেছে এই ঘটনাটা?

ম্যাকগ্রেভি জবাব দিল–আজ সকাল এগারোটায় লেক্সিংটন এভিনিউতে আপনার অফিস থেকে এক ব্লক দূরে। বেশ কয়েক ডজন লোক হয়তো তাকে রাস্তায় পড়তে দেখেছিল। কিন্তু কেউই খেয়াল করেনি। বরফের ওপর রক্ত ঝরাতে ঝরাতে উনি মারা যান।

জুড টেবিল ক্লথের একটা কোণ খামচে ধরলেন।

–মিঃ হ্যানসেন এখানে ঠিক কটায় এসেছিলেন ডাঃ স্টিভেন্স?

অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল।

–ঠিক দশটায়।

–কতক্ষণ ছিলেন?

–প্রায় পঞ্চাশ মিনিট।

–তারপর বেরিয়ে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, ওনার পরে আমার অন্য পেশেন্ট ছিল।

–উনি কি আপনার রিসেপশন অফিস দিয়ে বেরিয়ে ছিলেন?

–না, আমার পেশেন্টরা রিসেপশন অফিস দিয়ে ঢেকে আর বেরোয় এই দরজা দিয়ে। তাই আমার পরবর্তী পেশেন্টের সঙ্গে আগের পেশেন্টের দেখা হয় না।

–তাহলে দেখা যাচ্ছে মিঃ হ্যানসেন আপনার এখান থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পরেই মারা গেছেন। আচ্ছা, উনি কেন আপনার কাছে এসেছিলেন তা বলবেন কি?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জুড ইতস্তত করতে থাকেন। তারপর বলেন–ক্ষমা করবেন। ডাক্তার আর পেশেন্টের আলোচনা প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত নয়।

মনে রাখবেন, ওকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যাকগ্রেভি বলল, আপনার সাহায্য পেলে আমরা হয়তো হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারি।

জুডের পাইপ নিভে গিয়েছিল। উনি আগুন ধরাবার ছুতোয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল–উনি কতদিন আপনার কাছে যাতায়াত করছেন?

–তিনবছর।

–ওনার সমস্যাটা কী ছিল?

আবার ইতস্তত করতে দেখা গেল ডাঃ স্টিভেন্সকে। আজ সকালে দেখা জন হ্যানসেনের মুখটা মনে পড়ে গেল। আবেগকম্পিত মুখ। চোখ দুটিতে হাসির উপস্থিতি।

–ও ছিল সমকামী। অবশেষে তিনি বললেন।

ম্যাকগ্রেভির গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ–তাহলে এটা কোনো সুন্দরীর কারসাজি।

–সমকামী তিনি ছিলেন, আমি তাকে সারিয়ে তুলি। আজ সকালেই ওকে বলেছিলাম, আর আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই। উনি আবার সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারবেন। ওনার দুই ছেলে, মেয়ে আর স্ত্রী আছে।

–স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও? ম্যাকগ্রেভি জানতে চাইল।

–এই ধরনের ঘটনা অনেক দেখা যায়।

–কাজটা ওনার কোনো প্রাক্তন প্রেমিক করেছে কি? সামান্য বচসা থেকে ছুরি মারামারি হওয়াটা কি একেবারেই অসম্ভব?

ম্যাকগ্রেভির পরের প্রশ্ন।

জুড কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলেন–হতেও পারে? কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হচ্ছে না।

–কেন ডাঃ স্টিভেন্স? অ্যাঞ্জেলির কৌতূহল।

–কারণ গত একবছর ধরে হ্যানসেনের সঙ্গে কারোর যোগাযোগ ছিল না। বরং আমার : ধারণা কেউ বোকা বানিয়ে টাকা নিতে চেয়েছিল। সেরকম কিছু হলে হ্যানসেন ছেড়ে দেবার, পাত্র নয়।

গ্রেভি সিগারেট ধরাল–আপনার বোকা বানানোর থিয়োরিটাতে তো একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ওনার মানিব্যাগ স্পর্শ করা হয়নি। একশো ডলারের ওপর ছিল মানিব্যাগের মধ্যে ।

কথাটা বলে সে সন্তর্পণে জুডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে।

অ্যাঞ্জেলি বলল–কোনো উন্মাদের সন্ধান করলে মনে হয় আমাদের কাজটা সহজ হবে।

জুড জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন–কেউ উন্মাদ হলেই যে তার লক্ষণ বোঝা যাবে, এমন কোনো অর্থ নেই। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আমরা বাইরে থেকে পাগলামি প্রমাণ করতে পারি না।

ম্যাকগ্রেভি কৌতূহলী চোখে জুডকে লক্ষ্য করল। বলল–মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু আপনার জানা আছে দেখছি। কতদিন ধরে আপনি এসব নিয়ে চর্চা করছেন?

–বারো বছর। কেন?

–না, তেমন কিছু নয়।

–আপনি তো রীতিমতো সুদর্শন পুরুষ। তাই ধরে নিন, যদি আপনার পেশেন্টদের মধ্যে কেউ আপনার প্রেমে পড়ে যায়, তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে?

–আপনার প্রশ্নের অর্থ আমার কাছে ঠিক বোধগম্য হল না।

–আমার মনে হচ্ছে, আপনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। আমরা দুজনেই লাইনের লোক, তাই না ডাক্তার। একজন সমকামী তরুণ সুদর্শন চিকিৎসকের সামনে তার সমস্যা বলতে এল।

ম্যাকগ্রেভির গলা ক্রমশ রহস্যময় হয়ে ওঠে-আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, তিন বছরেও তার সঙ্গে আপনার কোনো মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি?

জুড ভাবলেশহীন মুখে তাকালেন–মানব চরিত্র সম্পর্কে আপনার কি এই ধারনা লেফটেন্যান্ট?

একটু বিচলিত না হয়ে ম্যাকগ্রেভি বলল–না, আমি শুধু অনুমান করছি। তাছাড়া আর কী কী হতে পারে তাও আপনাকে বলছি। আপনি যখন বললেন যে, আপনার কাছে আমার আর প্রয়োজন নেই, কথাটা হ্যানসেনের ভালো নাও লাগতে পারে। তিন বছর আপনার অধীনে ছিলেন। হয়তো এনিয়ে আপনাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল।

এই অভিযোগ শুনে জুডের মাথা গরম হয়ে গেল। শেষ অব্দি অ্যাঞ্জেলি ব্যাপারটা সামাল দিল–আচ্ছা, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যার সঙ্গে হ্যানসেনের সম্পর্কটা ভালো ছিল না? অথবা এমন কেউ, যাকে উনি মোটেই পছন্দ করতেন না?

–সে রকম কেউ থাকলে নিশ্চয়ই তার নাম বলে দিতাম কারণ জন হ্যানসেন সম্পর্কে সব তথ্যই আমার জানা। কারোর প্রতি তার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। কেউ তাকে অপছন্দ করেনি।

–আমরা ওনার ফাইলটা নিয়ে যাব।

–আমি দুঃখিত। ওটা দেওয়া সম্ভব নয়।

–দরকার হলে কোর্টের হুকুম আমরা আনতে পারি।

–তাই আনুন তা হলে। ওই ফাইলে যা আছে, তাতে আপনাদের কিছু কাজ হবে না।

–তাহলে ওটা আমাদের দিলে আপনার কী ক্ষতি হবে?

–হ্যানসেনের স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা ভুল জায়গাতে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, উনি একজন অচেনা অজানা লোকের হাতে খুন হয়েছেন।

ম্যাকগ্রেভি বলল–না, আমি তা বিশ্বাস করি না।

বর্ষাতিটা মুড়ে অ্যাঞ্জেলি তাতে দড়ি জড়িয়ে নেয়–আরো কিছু পরীক্ষা করে এটা আপানাকে ফেরত দেব।

–ওটা আমার প্রেয়োজন নেই। আপনারা রেখে দিতে পারেন।

ম্যাকগ্রেভি উঠে দাঁড়িয়ে করিডরের দরজাটা খুলল। বলল–আপনার সঙ্গে আবার। যোগাযোগ করব কেমন?

মাথা ঝাঁকিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। অ্যাঞ্জেলি তাকে অনুসরণ করল।

ক্যারল ঘরে ঢুকল। দেখল জুড তখনও দরজার দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

ক্যারল বলল–কোনো গন্ডগোল হয়নি তো?

–জন হ্যানসেনকে কেউ খুন করেছে।

ক্যারল চমকে উঠল–খুন করেছে?

–হ্যাঁ, ছুরি মেরেছে।

–কী সর্বনাশ! কিন্তু কেন?

–সেটা পুলিশও জানে না।

–হয় ভগবান!

জুডের বেদনার্ত চোখ দুটো লক্ষ্য করে ক্যারল বলল–আমাকে দিয়ে আপনার কি। কোনো সাহায্য হবে?

–তুমি বরং আজ অফিস বন্ধ করে দাও। আমি মিসেস হ্যানসেনের সঙ্গে দেখা করে আসি। খবরটা আমি নিজেই তাকে জানাব।

–ব্যস্ত হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

–ধন্যবাদ।

জুড বেরিয়ে গেলেন।

আধঘন্টা বাদে ক্যারল ফাইল পত্র গুছিয়ে টেবিলের দেরাজে চাবি আঁটতে যাচ্ছে, তখন করিডরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। চোখ তুলে তাকাতেই ও দেখল একজন হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

.

তিন

মেরি হ্যানসেনকে দেখতে যেন পটে আঁকা ছবি। ছোটোখাটো চেহারা, অপরুপ দেহ বল্লরী। সরলতার এই প্রতিমূর্তিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, খুবই অসহায়। অভিমানে গলে যাওয়া মোমের পুতুল। আসলে মনটা তার গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত।

জুড একবার মেরি হ্যানসেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জন হ্যানসেনের চিকিৎসা শুরু হবার এক সপ্তাহ বাদে। স্বামীর চিকিৎসা হচ্ছে শুনে মেরি ক্ষেপে উঠেছিল। তাই বাধ্য হয়ে জুডকে আসতে হয়েছিল। জুড জানতে চেয়েছিল, ওনার চিকিৎসার ব্যাপারে আপনার আপত্তি কীসের।

–তার কারণ আমি বন্ধু-বান্ধবীদের জানাতে চাই না যে, আমি একটা বদ্ধ উন্মাদকে বিয়ে করেছি। আরো বলেছিল মেরি, ওকে বলুন ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে। তারপর ও যা খুশি করতে পারে।

জুড বুঝিয়ে ছিলেন বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থ হল স্বামীকে সত্যি সত্যি ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেওয়া।

মেরি চেঁচিয়ে ওঠে- ধ্বংস হতে আর কী বাকি আছে? ওর এ রকম চরিত্র জানলে, আমি কি ওকে বিয়ে করতাম? মেয়ে-ছেলের বেহদ্দ একটা।

–আপনার স্বামীর ব্যাপারে কতগুলো জটিল মনোস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে মিসেস হ্যানসেন। তবে সেগুলো সারিয়ে তোলা যাবে। উনি নিজে একান্তভাবে চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয় ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আপনি ব্যাপারটা মেনে নিন।

সেদিন তিন ঘন্টা ধরে কথা বলেছিলেন ডাঃ জুড। একটা ব্যাপারে তিনি সফল হয়েছিলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে মেরিকে বিরত রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এ ব্যাপারে মেরিকে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, স্বামীর জীবন সংগ্রামের সাথে নিজেকে ধীরে ধীরে একাত্ব করে সে। জুড ঠিক করেছিলেন, কোনো দম্পতির একসঙ্গে চিকিৎসা করবেন না। কিন্তু মেরির ক্ষেত্রে তাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে হয়েছিল। অবশ্য মেরিকে পাওয়াতে এই কাজটা তাড়াতাড়ি করতে পেরেছিলেন। স্ত্রী হিসাবে মেরির ব্যর্থতার কারণগুলো জানার পর জন হ্যানসেনের নিরাময় দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে।

আর আজ উনি এসেছেন একটা শোক সন্তপ্ত সংবাদ জানাতে, কাজটা কত কঠিন ডাক্তার তা জানেন। কিন্তু খবরটা তো বলতেই হবে।

কথাটা শুনে মেরি এমন চোখে তাকাল যেন ডাক্তার ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন। পরক্ষণেই বলল সে-ও তার আমার কাছে কোনোদিন ফিরে আসবে না? বলে আর্ত চিৎকার করে উঠল, আপনি বলছেন ও আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসবে না? আহত–জন্তুর মতো ছটফট করতে করতে নিজের পোশাক ছিঁড়তে শুরু করল। গোলমাল শুনে। ছ-বছরের দুই যমজ শিশু ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা হয়ে উঠল ঠিক পাগলা গারদের। মতো।

জুড অনেক কষ্টে বাচ্চা দুটোকে শান্ত করলেন। পাশের বাড়ির এক প্রতিবেশীর কাছে ওদের পাঠিয়ে দিলেন। ফিরে এসে মেরিকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। পারিবারিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসার পর ধীরে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে।

মনের আকাশে চিন্তার মেঘের আনাগোনা। জুড এলোপাথাড়ি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হ্যানসেন যখন তীব্র সংগ্রাম করে জয়ের সীমারেখায় পৌঁছে গেছেন, তখন এই হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল? কোনো সমকামী বন্ধুই কি প্রণয় থেকে বঞ্চিত হয়ে এই কাজটি করেছে? ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ডাক্তার মন থেকে তা মানতে পারছিলেন না। লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি জানিয়েছে, ওনাকে পাওয়া গেছে ডাক্তারখানা থেকে এক ব্লক দূরে। হত্যাকারী যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ সমকামী বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে কোনো নির্জন জায়গাতেই সে আক্রোশ মেটাতে পারত। জনসমক্ষে এমন কাজ কেন করল?

দূরে একটা টেলিফোন বুথ নজরে পড়ল ডাক্তার জুডের। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আজ রাতে পিটার হ্যাডলি ও তার স্ত্রী নোরার সঙ্গে ডিনার খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। ওই পরিবারের সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক। কিন্তু আজ রাতে উনি কোথাও যেতে পারবেন না।

গাড়ি থামিয়ে বুথে ঢুকলেন। হ্যাডলির টেলিফোন নম্বর ডায়াল করলেন।

নোরা ফোন ধরলেন–কী ব্যাপার এত দেরি আপনার? কোথা থেকে ফোন করছেন?

–নোরা, আজকের দিনটা আমাকে মাফ করে দাও। আজ আমি যেতে পারছি না।

–কক্ষনো নয়। জানেন আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য একজন হাপিত্যেশ করে বসে আছে। ওঃ, যা দেখতে না ওকে।

–অন্য দিন আলাপ করতে বলো, নোরা। আজ সত্যি মেজাজ ভালো নেই। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

–দাঁড়ান এক মিনিট, চাইবার মজা টের পাওয়াচ্ছি।

পিটার হ্যাডলি ফোন ধরলেনকী খবর বন্ধু? জিজ্ঞাসা করি কোনো গন্ডগোল?

–না-না, সেরকম কিছু নয়। আজ অনেক কাজ পড়ে গেছে পিট, কাল দেখা হলে সব বলব।

–বন্ধু, তুমি এক মনোরম স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বস্তু থেকে বঞ্চিত হলে। এক কথায় বলা যায় অনবদ্য।

জুড হাসতে চেষ্টা করলেন–ঠিক আছে, অন্য কোনো সময় তার সঙ্গে দেখা করব। টেলিফোনে দ্রুত কিছু ফিসফিসানি শুনতে পেলেন। কোনো একটা গোপন পরামর্শ।

–নোরা আবার ফোন ধরলেন–ও আমার বড়ো দিনের ডিনারে আসবে। আপনি ওদিন। আসবেন তো?

–নোরা, এব্যাপারে পরে আলোচনা করব, কেমন? আজ ফোন ছাড়ছি।

কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিলেন জুড।

অনেক কথাই মনে পড়ে গেল তার। কলেজের শেষ সোপানে পৌঁছে জুড বিয়ে করেছিলেন। এলিজাবেথ ছিল ওই কলেজে সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রী। তারুণ্যের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ সমৃদ্ধ দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু নিয়তি বড়োই নিষ্ঠুর। তারপর এক বছর কাটেনি। বড়োদিনের দুর্ঘটনায় মারা গেল এলিজাবেথ। মারা গেল তাঁর অজাত সন্তান। এক নিমেষে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল ডাক্তারের চোখের সামনে। তারপর থেকে তিনি মন দিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। আজ দেশের অন্যতম মনোবিজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছেন। এর অন্তরালে আছে ওই শোক সন্তপ্ত স্মৃতি। কাউকে বড়োদিনের উৎসব পালন করতে দেখলে মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যায় ডাক্তারের। তিনি চান, ওই দিনটা সকলে এলিজাবেথ এবং তার অজাত সন্তানের জন্য শোক স্তব্ধতায় কাটাক। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি।

সাধারণত তাকে দেখলে বাড়ির দারোয়ান মাইক হাসিমাখা মুখ নিয়ে অভিবাদন জানায়। আজ কিন্তু তার হাসিতে অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া ছিল না। নিশ্চয়ই কোনো পারিবারিক ঝামেলা পাকিয়েছে লোকটা। তিনি ভাবলেন প্রায়ই তার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন করেন। কিন্তু আজ তাও ভালো লাগছে না। গাড়িটা গ্যারেজে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

–ঠিক আছে স্যার, কিছু বলতে গিয়ে মাইক নিজেকে সামলে নিল।

জুড বাড়িতে ঢুকলেন। লবিতে ম্যানেজার বেন কাটজের সঙ্গে দেখা হল। চোখাচোখি হল। ভদ্রলোক হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

জুড মনে মনে ভাবলেন, আজ হল কী সকলের? নাকি আমার মন দুর্বল বলে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে সকলে?

লিফটের দরজায় পা রাখলেন তিনি।

লিফট চালক এডি এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল–গুড ইভিনিং ডাঃ স্টিভেন্স।

–গুড ইভিনিং এডি। ঢোক গিলে দৃষ্টি সরিয়ে নিল এডি। –এডি কোনো গোলমাল হয়েছে কি?

এডি এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

জুড ভাবলেন, এও দেখছি এক রহস্যময় মানুষ। সমস্ত বাড়িটাই বোধহয় আজ ভুতুরে হয়ে উঠেছে।

লিফট থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। কিছু দূর এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তার মনে হল লিফটের দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনেননি কেন? ঘুরে তাকালেন। এডি এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন তাড়াতাড়ি দরজা টেনে সে নিজেকে আড়াল করে দিল।

কাঠের দরজায় চাবি ঘুরিয়ে জুড ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরে আলোগুলো জ্বলছে কেন? জুড অবাক হলেন। ম্যাকগ্রেভি বৈঠকখানার একটা দরজা জোর করে খুলতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময় অ্যাঞ্জেলি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

জুড জিজ্ঞাসা করলেন–আমার ফ্ল্যাটে আপনারা কী করছেন?

ম্যাকগ্রেভি শান্ত গলায় বলল–আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ডাঃ স্টিভেন্স।

জুড এগিয়ে এলেন। সদ্য খোলা ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলেন। একটুর জন্য ম্যাকগ্রেভির আঙুলগুলো বেঁচে গেল।

–এখানে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে?

–আমাদের সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। অ্যাঞ্জেলি বলল।

–সার্চ ওয়ারেন্ট? আমার ফ্ল্যাটে?

–আমরা যদি কিছু প্রশ্ন করি, আপনি কি উত্তর দেবেন? ম্যাকগ্রেভি জানতে চাইল। উকিল ছাড়া ওগুলোর উত্তর দেওয়া বা না-দেওয়া সবকিছু আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করছে। অ্যাঞ্জেলি আরও বলল–মনে রাখবেন, আপনি এরপর থেকে যা বলবেন, সে গুলো আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে ব্যবহৃত হতে পারে।

ম্যাকগ্রেভি জানতে চাইল–আপনি কি উকিলকে খবর দিতে চান?

–প্রয়োজন নেই, জুডের গলায় রাগ, আমি আগেই জানিয়েছি জন হ্যানসেনকে রেইন কোটাটা ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা আপনারা ওটা আমার অফিসে এনেছেন। এর মধ্যে জিনিসটাকে আমি দেখিনি। হ্যানসেনকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ সারাদিন আমি নিজের কাছে ব্যস্ত ছিলাম। মিস রবার্টস-এর সাক্ষী।

ম্যাকগ্রেভি এবং অ্যাঞ্জেলি দৃষ্টি আদান-প্রদান করল।

অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল–আমরা আসার পর অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

–মিসেস হ্যানসেনের বাড়িতে।

–ওটা আমরা জানি। তারপর?

সামান্য ইতস্তত করে জুড জবাব দিলেন–গাড়ি নিয়ে ঘুরছিলাম।

–কোথায়?

–কানেকটিকাট পর্যন্ত গিয়েছি।

–ডিনারে কোথায় খেয়েছেন?

–খাইনি। এখনও পর্যন্ত খাওয়ার সুযোগ হয়নি।

–মিসেস হ্যামসেনের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর কেউ আপনাকে দেখেছে কি?

–মনে হয় না।

–গাড়িতে পেট্রল ভরতে নিশ্চয়ই কোথাও থামতে হয়েছিল?

অ্যাঞ্জেলি কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

–না, তার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যার পর আমি কোথায় গিয়েছি, তা আপনারা জানতে চাইছেন কেন? হ্যানসেন তো সকালেই মারা গেছেন।

–সন্ধ্যের পর অফিস থেকে বেরিয়ে আবার কি এখানে ফিরে এসেছিলেন–ম্যাকগ্রেভি জানতে চাইল।

–না।

–আপনার অফিসের দরজা খোলা ছিল।

–তার মানে? কে খুলেছে আমার অফিস?

–সেটা আমরা জানতে পারিনি। আপনাকে আমরা ওখানে নিয়ে যাব। কিছু হারিয়েছে কিনা, আপনি আমাদের তা জানিয়ে দেবেন।

–নিশ্চয়ই। কিন্তু খবরটা কে দিয়েছে আপনাদের?

–রাত্রের দারোয়ান, অ্যাঞ্জেলি বলল, আফিসে আপনি দামি কিছু রাখেন কি? টাকাকড়ি ওষুধপত্র এইসব?

–না, টাকা সামান্যই থাকে। কোনো মাদক ওষুধ আমি রাখি না। চুরি করার মতো কিছু নেই আমার অফিসে।

–বেশ, এবার চলুন।

লিফট চালক এডি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকিয়েছে। জুড সরাসরি তার দিকে তাকাল। ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

অফিসের তালা ভেঙে ঢোকার ব্যাপারে পুলিশ তাকে সন্দেহ করেনি, এ ব্যাপারে জুড–নিঃসন্দেহ। সম্ভবত ম্যাকগ্রেভি তার প্রাক্তন সহকারীর হেনস্তার কথা স্মরণ করেছে। কিন্তু সেটা তো পাঁচ বছর আগের ঘটনা। ম্যাকগ্রেভি কি এতদিন সুযোগের অপেক্ষাতে ছিল?

গেটের কয়েক ফুট দুরে গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল, পুলিশের জীপ। জুড নিঃশব্দে উঠে বসলেন।

লবির হাজিরা খাতায় সই করতে করতে জুড লক্ষ্য করলেন, দারোয়ান বিগলো অবাক চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে। ম্যাকগ্রেভি আর অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে পনেরো তলায় লিফটে

উঠলেন তিনি। নিজের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজার সামনে পোশাক পরা পুলিশ। ম্যাকগ্রেভিকে সেলাম ঠুকল।

জুড পকেট থেকে চাবি বের করলেন।

অ্যাঞ্জেলি এক ধাক্কায় পাল্লা খুলে দিল। জুড আগে পা বাড়ালেন।

বসার ঘরটা লন্ডভন্ড। দেরাজগুলো খোলা। মেঝেতে কাগজের হুড়োহুড়ি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

–ডাক্তার স্টিভেন্স, ওরা কীসের খোঁজে এখানে এসেছিল বলে আপনার মনে হয়?

ম্যাকগ্রেভি আচমকা প্রশ্ন করল–আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী হচ্ছে এখানে?

দরজা ঠেলে জুড ভেতর ঘরে ঢুকলেন। এই ঘরটা জুডের একান্ত ব্যক্তিগত। দুটি টেবিল উল্টে দেওয়া হয়েছে। আলো চুরমার হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কার্পেটে রক্তের দাগ। ঘরে এক কোণে অদ্ভুতভাবে পড়ে আছে ক্যারল রবার্টসের সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহ। হাত দুটো পিঠের পেছনে তার দিয়ে বাঁধা। বুক, মুখ আর দুটি উরুর সন্ধিস্থল অ্যাসিডে পোড়ানোনা। ডান হাতের আঙুলগুলো কেউ বা কারা দুমড়ে ভেঙে দিয়েছে। ঘেঁতলানো মুখে একটা রুমাল দলা করে খুঁজে দেওয়া।

জুডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অ্যাঞ্জেলি বলল–বসুন ডাঃ স্টিভেন্স।

জুড মাথা নাড়লেন। বেশ কয়েকটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। উত্তেজনায় থরথর করে তিনি কাঁপছেন। কে, কে একাজ করল?

–সেটাই আপনি আমাদের জানাবেন ডাঃ স্টিভেন্স, ম্যাকগ্রেভি বলল।

–ক্যারলকে কেউ এভাবে হত্যা করতে পারে কি? জীবনে ও কাউকে আঘাত দেয়নি।

–মিস্টার হ্যানসেন কাউকে আঘাত দেননি, অথচ তার পিঠে ছুরি মারা হল। ক্যারল রবার্টস কাউকে আঘাত দেয়নি, অথচ তার সারা দেহে অ্যাসিড ঢেলে রীতিমতো নিপীড়ন করার পর তাকে হত্যা করা হল-ম্যাকগ্রেভির গলায় কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। সে আবার বলতে থাকে–চার বছর মেয়েটি আপনার কাছে কাজ করছে। আপনি কি বলতে চাইছেন মনোবিজ্ঞানী হিসাবে আপনি ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেননি? আপনার এই মিথ্যে কথাটা আমাকে কি মানতে হবে?

জুড কঠিন গলায় বললেন–কৌতূহল আমার অবশ্যই ছিল। ওর এক পুরুষ বন্ধুকে আমি চিনতাম, যাকে ও বিয়ে করত।

–ঠিক। তার সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে।

–কিন্তু তার পক্ষে একাজ কখনওই সম্ভব নয়। ভালো ছেলে ছিল সে। ক্যারলকে ভীষণ ভালোবাসত।

–জীবিত অবস্থায় ওকে আপনি কখন শেষ দেখেছেন? অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল।

–ওটা আমি আগেই আপনাদের জানিয়েছি। মিসেস হ্যানসেনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার ঠিক আগে আমি ক্যারলকে বলেছিলাম, অফিসের দরজা বন্ধ করতে।

–আজ কি আর পেশেন্ট আসার কথা ছিল?

–না।

–আপনি কি মনে করেন, এটা কোনো বদ্ধ উন্মাদের কাজ?

–নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কেন?

–আমিও তাই ভাবছিলাম, ম্যাকগ্রেভি বলল।

ক্যারলের উলঙ্গ দেহটার দিকে তাকিয়ে জুড বললেন–আর কতক্ষণ ওকে এভাবে ফেলে রাখবেন?

অ্যাঞ্জেলি বলল–এখনই নিয়ে যাওয়া হবে। হোমিসাইড আর করোনার ডিপার্টমেন্ট কাজ সেরে ফেলেছে।

জুড বললেন–আমার জন্যই তা হলে মৃতদেহটা এইভাবে রাখা হয়েছিল?

–আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আবার করছি, আপনার অফিসে এমন কোনো বস্তু আছে কি, যেটা কারোর পক্ষে...

ক্যারলকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করল ম্যাকগ্রেভি।

–না।

–আপনার পেশেন্টদের রেকর্ড?

–সেরকম কিছু নেই।

–আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইছেন না ডাঃ স্টিভেন্স। ম্যাকগ্রেভি বলল। কণ্ঠস্বর ঋজ ফুটেছে।

–ফাইলগুলো থেকে যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যেত তা হলে অবশ্যই জানাতাম। আমার পেশেন্টদের আমি ভালো করেই চিনি। আমার পেশেন্টদের মধ্যে কেউ ক্যারলকে এইভাবে হত্যা করতে পারে না। এটা বাইরের লোকের কাজ।

–কেউ ফাইলগুলোর খোঁজ করেনি আপনি কী করে জানলেন?

–ওগুলো স্পর্শ করা হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে ম্যাকগ্রেভির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল–সেকি?

–ওগুলো তো আপনি দেখেন নিও।

জুড উঠলেন। দেওয়ালের কাছে গিয়ে কাঠের তক্তা মারা একটা অংশে চাপ দিলেন। দেওয়ালটা দুভাগ হয়ে গেল। সারি সারি কয়েকটা তাক বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেকটা তাকে, অসংখ্য টেপ রয়েছে।

–আমার পেশেন্টদের সঙ্গে প্রত্যেকবার সাক্ষাতকারের বিবরণ আমি টেপে তুলে নিই। এটাই আমার ফাইল। ওগুলো এখানে রাখা থাকে।

–ধরুন, জায়গাটা জানার জন্য কেউ অত্যাচার করেছে?

–এই সব টেপে যা ভোলা আছে, তা কারোর কাজে লাগবে না। না-না, ওকে খুন করার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

ক্যারলের নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে জুড ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইলেন–কারা বা কে এই নৃশংস কাজ করেছে তা আমাদের জানতেই হবে।

–সেই রকমই তো ইচ্ছে, জুডের দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যাকগ্রেভি।

.

অ্যাঞ্জেলিকে ম্যাকগ্রেভি বলল ক্যারল রবার্টসের পোস্টমর্টেম এইমাত্র শেষ হল।

ম্যাকগ্রেভি সাগ্রহে জানতে চাইল–ফলাফল।

–মেয়েটির পেটে বাচ্চা ছিল। তিনমাস প্রায়, গর্ভপাতের পথে সময়টা একটু বেশি।

–আপনার কি মনে হয় এর সঙ্গে খুনের কোনো সম্পর্ক আছে?

চেয়ার টেনে বসল ম্যাকগ্রেভি–ভালোই প্রশ্ন করেছ। এই কাজটা যদি ক্যারলের সেই বন্ধুটির হয়, আর যদি ওরা বিয়েই করবে বলে ঠিক করে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বাচ্চার জন্ম হচ্ছে। এ ঘটনা রোজই ঘটছে। কিন্তু যদি ওরা বিয়েতে রাজী না হয় তাহলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘুরে যাচ্ছে তাই তো? বাচ্চাটা জন্মাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা স্বামীর পরিচয় দিতে পারছে না।

–কিন্তু চিকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, ও ক্যারলকে বিয়ে করতে রাজী ছিল।

–জানি, ম্যাকগ্রেভি গম্ভীর হল। কিন্তু ধরো, চিক না হয়ে যদি অন্য কেউ সন্তানের বাবা হয়ে থাকে?

অ্যাঞ্জেলি এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলে না।

ম্যাকগ্রেভি বলতে থাকে–মনে করো সে লোকটা একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। বিরাট পসার আছে তার। ক্যারল তাকে জানাল, ও গর্ভপাতে রাজী নয়। তার ইচ্ছে মা হবার। অথবা নিছক ব্ল্যাকমেল করার জন্য সে এভাবে কথাটা বলতে পারে। লোকটার পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। কারণ সে জানে, এককালের বাজারে মেয়েছেলে কী না করতে পারে? তার যাবতীয় মান-সম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি দেবে। ব্যাপারটা একদিন প্রকাশ হবেই।

অ্যাঞ্জেলি বলল–কিন্তু স্টিভেন্স একজন ডাক্তার। সে অন্য পদ্ধতিতে খুন করতে পারত। কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হত না।

ম্যাকগ্রেভি বলল–হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো সন্দেহজনক সূত্র বেরিয়ে পড়ার সম্ভবনা ছিল। যেসব বিষাক্ত ওষুধ সে কেনে তার রেকর্ড দোকানে থাকে। দড়ি বা ছড়ি কিনলেও সেটা জানা যেত। কিন্তু এই সুন্দর সাজানো ঘটনাটা একবার ভেবে দেখত। একজন উন্মাদ বিনা কারণে অফিসে ঢুকল রিসেপশনিস্টকে খুন করল। এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করল যাতে অফিস মালিক পরে পুলিশের কাছে এসে বলতে পারে, অবিলম্বে হত্যাকারীকে ধরে দিন স্যার।

–হ্যাঁ, বেশ জটিল কেস।

–হ্যাঁ, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। এবার তার রোগীর কথা–জন হ্যানসেন আর একটি উদ্দেশ্যহীন হত্যা। এটাও অজ্ঞাত উন্মাদ এক আততায়ীর হাতে। একই দিনে দু-দুটো ঘটনা। এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি? ভেবে দেখলাম, শেষ পর্যন্ত থাকাটা অসম্ভব নয়। ক্যারল রবার্টস এসে স্টিভেন্সকে জানাল, সে বাবা হতে চলেছে। শুরু হল বাক বিতণ্ডা। ক্যারল ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করল। বলল, তাকে বিয়ে করতে হবে তা না হলে মোটা টাকা দিতে হবে। জন হ্যানসেন বাইরের অফিস ঘরে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। স্টিভেন্স ব্যাপারটা জানত না। তারপর সে ঘরে ঢুকে ভয় দেখাল। খবরটা সে ফাঁস করে দেবে, যদি না স্টিভেন্স...

–এতে আপনার অনুমান, অ্যাঞ্জেলি প্রতিবাদের চেষ্টা করে।

–হতে পারে, কিন্তু সব মিলে যাচ্ছে। হ্যানসেন বাইরে বেরোতেই ডাক্তার এমন ব্যবস্থা করে ফেলল, যাতে সে আর মুখ খুলতে না পারে। ফিরে এসে ক্যারলের ব্যবস্থাও করে

ফেলল সে। তারপর অ্যালিবাই ঠিক করতে মিসেস হ্যানসেনের সঙ্গে দেখা করল। কানেকটিকাট পর্যন্ত বেরিয়ে এল। সমস্ত সমস্যার সমাধান।

–আমি মানতে পারছি না। কোনোরকম বাস্তব প্রমাণ হাতে না পেয়েই আপনি একটা মার্ডার কেস খাড়া করতে চাইছেন।

অ্যাঞ্জেলি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরে বলে উঠতে চায়।

–বাস্তব প্রমাণ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? দু-দুটি মৃতদেহ আমরা পেয়েছি। একটি অন্তঃসত্তা মহিলা, যে স্টিভেন্সের কাছে কাজ করত। অন্যটি তারই এক পেশেন্টের, যাকে ওই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। লোকটা সমকামী। স্টিভেন্সের কাছে আমি যখন টেপগুলো শুনতে চাইলাম, সে আমাকে অনুমতি দিল না। কাকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে? আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোনো কিছুর সন্ধানে কেউ তার অফিসে আসতে পারে কিনা? এটা হলে আমরা একটা যুক্তি খাড়া করতে পারতাম। আমরা বলতে পারতাম, ক্যারল সেই জিনিসটা দেয়নি বলেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার বদলে কী হল? আমরা শুনলাম, রহস্যজনক কোনো কিছু ওর অফিসে নেই। টেপগুলোর মূল্য অন্য কারো কাছে নেই। অফিসে কোনো মাদক দ্রব্য ডাক্তার রাখেনি। টাকা-পয়সা ছিল না। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত একটা উন্মাদের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকতে হবে সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে। সুতরাং আর একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ডাঃ স্টিভেন্সের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

–তা হলে ওকে ফাঁদে ফেলতে আপনি বদ্ধপরিকর? অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল। I ম্যাকগ্রেভি বলল–তার কারণ অপরাধটা ওই করেছে।

–আপনি ওকে অ্যারেস্ট করছেন?

–আপাতত আমি সুতো ছেড়ে রাখছি। ওর প্রত্যেকটা গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে।

অ্যাঞ্জেলি চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাকগ্রেভির দিকে। ডাঃ স্টিভেন্স যদি কিছু না করেও থাকেন, তাহলে ম্যাকগ্রেভি তাঁকে রেহাই দেবে না। কিন্তু কিছুতেই অ্যাঞ্জেলি সেটা হতে দেবে না। ক্যাপ্টেন বারটেলির সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

.

চার

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে বেরোল ক্যারল রবার্টসের। লোমহর্ষক হত্যার বর্ণনা। জুড ঠিক করেছিলেন, রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত সাক্ষাৎকার বাতিল করে দেবেন। সারারাত তার ঘুম হয়নি। চোখ দুটো ভারী হয়ে পড়েছিল। রোগীদের তালিকাটা পড়তে গিয়ে দেখলেন বাতিল করলে দুজন তার ওপর ভীষণ রেগে যাবে। তিনজন মনঃক্ষুণ্ণ হবে। বাকি কজনকে বোঝালে অবশ্য বুঝবে। শেষ পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি ভাবলেন, রুটিন না ভাঙাটাই উচিত। রোগীদের স্বার্থ তাতে রক্ষা করা যাবে, মনটাও কিছুক্ষণের জন্য অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে।

আগেই দপ্তরে পৌঁছলেন জুড। করিডরে সাংবাদিকদের ভিড়। দূরদর্শন কর্মী ইতিমধ্যেই এসে গেছে। আলোকচিত্রীরা ক্যামেরা নিয়ে রেডি। কাউকে তিনি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন না। বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা চলে গেল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। নিজের ঘরের পাল্লা ঠেলতে গিয়ে মনটা সামান্য আনমনা হয়ে গেল। রক্তাক্ত কার্পেটটা পুলিশ সরিয়ে নিয়েছে। ঘরটা আগেকার মতোই স্বাভাবিক লাগছে।

তফাত শুরু একটাই, ক্যারল আর কোনোদিন এখান দিয়ে হাঁটবে না। ওর, প্রাণচঞ্চল শরীরটা আর কখনও তার দিকে চেয়ে ঝংকার তুলবে না।

প্রথম রোগী পৌঁছে গেছে। হ্যারিসন বার্কআন্তর্জাতিক ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের সহ সভাপতি। জুড যখন বার্ককে প্রথম দেখেছিলেন তখন একটা প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল। চেহারার জোরেই কি লোকটা এত উঁচু পদ পেয়েছে? নাকি পদের দৌলতেই চেহারাতে জৌলুস এসেছে।

কৌচের ওপর সম্পূর্ণ দেহ এলিয়ে বার্ক বসেছিলেন। কেসটা মাস দুই আগে ডাঃ পিটার হ্যাডলির কাছ থেকে তাঁর কাছে এসেছে। মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগী, প্রবণতা নরহত্যার দিকে।

সকালে যে খবরটা খবরের কাগজের পাতায় বেরিয়েছে তার কথা বার্ক একবারও বললেন না। এটাই ওনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি বললেন–আপনি আমার কথাগুলো সেদিন জানতে চাইলেন না। ওরা যে আমার পেছনে লেগেছ, তার প্রমাণ আমি নিয়ে এসেছি।

জুড সতর্ক হয়ে জবাব দিলেন–আমি ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে খোলা মন নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। গতকালের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।

বার্ক হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করলেন–ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে।

–আপনি আরাম করে বসুন না, জুড পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করলেন।

বার্ক বললেন–আমার প্রমাণগুলো আপনি তাহলে শুনতে চান না?

জুড বললেন–আমি আপনার বন্ধু, আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।

গত কয়েক মাসে লোকটার আচরণ একেবারে পাল্টে গেছে। বার্ক কাজে ঢুকেছিলেন সামান্য একজন পিওন হিসাবে। পঁচিশ বছরে তিনি প্রতিষ্ঠানের চুড়োর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। চার বছর আগে সাদাম্পটনের গ্রীষ্মবাসে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়। তখন তিনি বাহামাতে রক্ষিতার কাছে ছুটি কাটাচ্ছেন। কেউ বোধহয় ভাবতে পারেনি, ওই ট্র্যাজিক ঘটনাটিকে তিনি মনের ভেতর স্থান দেবেন। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য নিজেকে দায়ী করে নিলেন। সবসময় গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাত করলেন না। এমন কী সন্ধ্যের

পর বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। সেই সময় একটা ছবি তার মনে ভেসে উঠেছিল। রক্ষিতার সঙ্গে বিছানাতে তিনি সঙ্গমে মত্ত। তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে মরছে। কেবলই তার মনে হত, তিনি কাছে থাকলে ওদের হয়তো বাঁচাতে পারতেন। চিন্তাটা একসময় আচ্ছন্নতার রূপ নিল। লোকে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে লাগল।

বার্ক প্রচণ্ড চতুর। তিনি নিজের ঘরে বসে লাঞ্চ করতে লাগলেন। বছর দুয়েক আগে কোম্পানির একজন নতুন সভাপতির প্রয়োজন পড়ল। হ্যারিসন বার্কের নাম সেখানে প্রস্তাব করা হল না। বাইরে থেকে একজনকে আনা হল। আরও একবছর বাদে কার্যনির্বাহক সহ সভাপতি নামে একটি নতুন পদের সৃষ্টি করা হল। তাকে বার্কের ওপর বসানো হল। বার্ক বুঝতে পারলেন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। গোপনে তিনি গোয়ন্দাগিরি শুরু করলেন। রাতের অন্ধকারে টেপরেকর্ডার লুকিয়ে নিয়ে রাখলেন সদস্যদের দপ্তরে। কিন্তু বরাত মন্দ। ছ-মাস বাদে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন। দীর্ঘদিনের চাকরি আর পদমর্যাদা তাঁকে বরখাস্তের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

এরপর তাঁর কাজের চাপ কমাতে তাকে কিছু হালকা দায়িত্ব দেওয়া হল। বার্ক ভাবলেন, তাকে তাড়ানোর চক্রান্ত চলছে। আরও কিছুদিন বাদে তিনি বুঝতে পারলেন বাইরের লোকেরাও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি রাস্তায় হাঁটলে কেউ তাকে অনুসরণ করে। টেলিফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। তার চিঠিপত্র খুলে দেখা হচ্ছে। খাবারে বিষ মেশানো হতে পারে। এই ভয়ে শান্তিতে খাওয়া ত্যাগ করলেন। ওজন কমতে শুরু হল। ডাক্তার পিটার হ্যাডলির সঙ্গে কোম্পানির সভাপতি তার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। বার্ক অবশ্য প্রতিবাদ করেন নি। ডাক্তার হ্যাডলি বার্কের সঙ্গে আধঘন্টা সময় কাটালেন। তিনি

বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা তার কেস নয়। তিনি টেলিফোনে জুডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জুডের নোটবইতে একটুও জায়গা নেই। কিন্তু ডাঃ হ্যাডলি কেসটার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। জুড অনুরোধটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

সেই হ্যারিসন বার্ক এখন কৌচের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন।

জুড বললেন–আপনার প্রমাণগুলো বলুন।

–ওরা কাল রাতে তালা ভেঙে আমাকে খুন করতে ঢুকেছিল। কিন্তু আমি এখন যে ঘরটাতে শুই, তার প্রত্যেকটা দরজা ভেতর থেকে তালা লাগানো থাকে। ওরা ভেতরে ঢুকলেও আমার ঘরে ঢুকতে পারেনি।

–পুলিশকে জানিয়েছেন?

–জানিয়ে কী হবে? পুলিশ তো ওদের দলে।

–আপনি তথ্য দেওয়াতে আমি খুশি হলাম। আন্তরিক স্বরে জুড বললেন।

বার্ক জানতে চাইলেন–এতে আপনার কী সুবিধা হল?

–আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। টেপেও তুলে নেওয়া হচ্ছে, যাতে কেউ আপনাকে হত্যা করলে চক্রান্তটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বার্কের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল–বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা। টেপ থাকলে ওদের আর রেহাই নেই।

–না-না, আপনি শুয়েই থাকুন।

বার্ক মাথা নেড়ে গা এলিয়ে দিলেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, আমি বড়োই ক্লান্ত, চোখ বন্ধ করতে সাহস হয় না। আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে বুঝতে পারতেন।

ম্যাকগ্রেভির কথা মনে পড়ে গেল জুডের। মুখে বললেন–আপনার চাকর তালা ভাঙার শব্দ পেয়েছে?

–কেন আপনাকে বলিনি? দুমাস হল তাকে বিদায় করে দিয়েছি।

দিন তিনেক আগে উনি জানিয়েছেন, ওই দিন চাকরের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি হয়ে গেছে। অর্থাৎ সময়জ্ঞানটাও হারিয়ে ফেলেছেন মিঃ বার্ক। আপনি কি নিশ্চিত সেটা দুহপ্তা আগের । ঘটনা?

বার্ক বললেন–ভুল আমি কখনো করি না। আপনি কি মনে করেন এত বড়ো একটা ইস্পাত কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আমাকে এমনি বসিয়ে রাখা হয়েছে?

–আপনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন?

–আমার খাবারে সে বিষ মেশাচ্ছিল।

–কী ভাবে?

–শূয়োরের মাংস আর ডিমের প্লেটে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল।

–কী করে বুঝলেন?

–বিষের গন্ধ আমি খুঁকেই বুঝতে পারি।

হতাশা ছড়িয়ে পড়ল জুডের মধ্যে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত তিনি ভেবেছিলেন, বার্কের অসুখ সারিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই কেসটা সমাধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো কোনো মানুষের মন এমন বিকারগ্রস্ত হয়ে যায় যে, সেই মানুষটি আর সাধারণ জীবনের উপত্যাকায় পা রাখতে পারে না।

কিছুক্ষণ বাদে তিনি বললেন মিঃ বার্ক, আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। ওরা যদি আপনার বিরুদ্ধে লেগে থাকে, তার অর্থ কী? অর্থ হচ্ছে, ওরা আপনাকে দিয়ে কোন মারাত্মক কাজ করিয়ে নিতে চাইছে। ওরা আপনাকে হয়তো উসকানি দেবে। কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিন ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবেন না। আমার ধারণা, যদি এইভাবে আপনি নিজেকে নিস্পৃহ রাখেন, তা হলে ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বার্ক বললেন–ঠিক বলেছেন তো। ঠিক আছে, এখন থেকে আরও বেশি বুঝে সমঝে চলব আমি।

বাইরের ঘরে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। জুড হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পরবর্তী রোগী পৌঁছে গেছে।

নিঃশব্দে টেপ রেকর্ডারের বোতাম বন্ধ করলেন তিনি, আজ এই পর্যন্ত থাক।

–সমস্তটা আপনি টেপ করেছেন?

–প্রত্যেকটা শব্দ। আজ আর অফিসে যাবেন না। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

বার্ক বললেন–অফিসে না গেলে ওরা আমার চেম্বারের দরজা থেকে আমার নাম খুলে অন্য লোকের নাম আটকে দেবে। আমাকে অফিস যেতেই হবে।

জুডের মন আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ তার মেরুদন্ড বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গেল। হ্যানসেন আর ক্যারলের হত্যাকাণ্ডে কি বার্কের হাত থাকা সম্ভব? বার্ক এবং হ্যানসেন দুজনেই তার রোগী। ওদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকাটা মোটেই বিচিত্র নয়। কারণ গত দুমাসে হ্যানসেনের পরেই বার্কের সাক্ষাৎকারের সময় বাঁধা ছিল। দেখা হতেই পারে করিডরে, তা হলে? কিন্তু ক্যারল? ক্যারলের কাছে বার্ক ভীতিপ্রদ কিছু দেখেছিলেন কি? স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ের মৃত্যুর পর মানসিক দিক থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্যাপারটা সত্যি কি একটা দুর্ঘটনা ছিল?

পরবর্তী রোগিনীকে আহ্বান জানালেন–আসুন।

অ্যানি ব্লেক কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওকে দেখে আবার সেই হৃদয় মোড়ানো অনুভূতিটা অনুভব করলেন জুড। এলিজাবেথের পর কোনো মহিলা তাঁর হৃদয়কে এতখানি দোলা দিতে পারেনি।

অথচ দুজনের মধ্যে কোনো মিল নেই। এলিজাবেথের ছিল সোনালি চুল, ছিল ছোটো করে ছাঁটা বেনী আর নীল চোখ। অ্যানি ব্লেকের চুল কালো, চোখের রঙ অবিশ্বাস্য বেগুনি। গড়নটা এলিজাবেথের চেয়ে লম্বা। হয়তো আরও কয়েকটা সুন্দর চড়াই উত্রাই-এর সমরোহ। তার সজীব বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সৌন্দর্যের মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যাকে অহংকার বলা যেতে পারে। দুটি চোখের ভেতর আছে অদ্ভুত প্রাণবন্ততা।

অ্যানির বয়স পঁচিশ। নিঃসন্দেহে জুড এর থেকে সুন্দরী স্ত্রীলোক জীবনে কোনোদিন দেখেনি। কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়াও অন্য একটা কিছু আছে, যা জুডকে আকর্ষণ করে। ওকে দেখে মনে হয় ওর সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিতি।

তিন সপ্তাহ আগে অ্যানি প্রথম এসেছিল। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেনি। ক্যারল দেখা করার অনুমতি দেয়নি। ক্যারল বুঝিয়ে বলেছিল, সেদিনের তালিকাটা ভর্তি আছে। নতুন কোনো রোগীকে তার মধ্যে ঢোকানো সম্ভব নয়। অ্যানি বলেছিল, ও কেবল অপেক্ষা করার অনুমতি পেলেই খুশি হবে।

দু-ঘন্টা পরেও তাকে একইভাবে সোফায় বসে থাকতে দেখে ক্যারল অস্বস্তিতে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যারল নিজে উদ্যোগী হয়ে ওই প্রতীক্ষিত সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করে।

মেয়েটিকে প্রথমদিন দেখার পর থেকেই জুড মনের ভেতর একটা তাড়না অনুভব করতে থাকেন। প্রথম দিনের কথাবার্তা জুড এখন ভুলে গেছেন। শুধু মনে আছে, বসতে বলার পর ও বলেছিল, অ্যানি ব্লেক, বিবাহিতা। সমস্যার কথা জানতে চাইলে, প্রথমটায় দ্বিধা করে বলেছিল, এ বিষয়ে ও নিজেই নিশ্চিত নয়। এমন কী সত্যি কোনো সমস্যা আছে কিনা, তাও সে জানে না।

একজন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে জুডের নাম শুনেছে। তাই দেখা করতে এসেছে। জুড সেই চিকিৎসক বন্ধুটির নাম জানতে চেয়েছিলেন। ও বলতে রাজী হয়নি। জুড অবশ্য আগেই তা অনুমান করেছিলেন।

এরপর তিনি বোঝালেন, অন্য কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে কিন্তু অ্যানি নাছোড়বান্দা। তাই রাজী না হওয়া ছাড়া জুডের কোনো উপায় ছিল না। মেয়েটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ওর সমস্যাটা খুবই সাধারণ। আলোচনায় বসে জুড দেখলেন ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। কথায় কথায় স্বামীর বিষয়ে প্রশ্ন করাতে মেয়েটি বলেছিল, ও খুব ভালো লোক। সাংসারিক জীবনে আমি খুবই সুখী।

জুড তখন প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলেন। আপনি কোথায় জন্মেছেন?

–রিভিরিতে, বোস্টনের কাছে ছোট্ট শহর।

–আপনার মা-বাবা বেঁচে আছেন?

–বাবা বেঁচে আছেন, আমার যখন বারো বছর, তখন মা মারা যায়।

–মা-বাবার সম্পর্ক নিশ্চয়ই ভালো ছিল?

–হ্যাঁ।

–কোনো ভাইবোন?

–না। আমিই একা। যার জন্য উচ্ছন্নে গেছি। বলে সে হেসেছিল। তার মধ্যে ছলনার চিহ্ন ছিল না।

প্রশ্নের মাধ্যমে জুড আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অ্যানি বলেছিল, মার মৃত্যুর পর বিদেশে বাবার কাছে সে থাকত। বাবা ছিলেন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কর্মী। তিনি যখন আবার বিয়ে করে ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে গেলেন তখন অ্যানি বাবার সঙ্গে যায়নি। দোভাষীর কাজ নিয়ে আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করল। মাতৃভাষা ছাড়া ফরাসি, ইতালিয়ান আর স্প্যানিশে কথা বলতে পারে সে। বাহামায় ছুটি কাটাতে গিয়ে হবু স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়। সে ছিল কারখানার মালিক। প্রথম দর্শনে লোকটাকে ভালো লাগেনি। লোকটা বারবার বিরক্ত করতে থাকে। বাহামা থেকে চলে আসার দু-মাস বাদে নিজে এসে যোগাযোগ করে। অ্যানি তখন তার প্রেমে একেবারে মশগুল। এরপর বিয়েতে আর দেরী হয়নি। ছমাস কেটে গেছে। ওরা এখন থাকে নিউজার্সির একটা জমিদার বাড়িতে।

আধ ডজন বৈঠকের পর অ্যানি সম্পর্কে জুড এইটুকু মাত্র জানতে পেরেছেন। আজও তিনি ওর সমস্যা সম্পর্কে এতটুকু আঁচ পাননি। এসব নিয়ে আলোচনাতে যেন আপত্তি আছে মেয়েটির।

কতবার ডাক্তার জানতে চেয়েছিলেন, স্বামীর সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আছে কিনা। দৈহিক দিক থেকে অসঙ্গতি? অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক? এমন কী জানতে চেয়েছিলেন যে, মেয়েটির সাথে অন্য পুরুষের সম্পর্ক আছে কিনা? উত্তর দিতে গিয়ে অ্যানি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

আরও অনেক প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন জুড। পানাভ্যাস যৌন প্রবৃত্তি, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে অ্যানি উত্তর দিয়েছে। যখন কোনো ব্যাপারে চেপে ধরা হয়েছে, তখন বলেছে, একটু ধৈর্য ধরুন ডাক্তারবাবু। আমাকে নিজের মতো করে এগোতে দিন।

তারপর থেকে অ্যানির পছন্দ মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাবার সঙ্গে অ্যানি অন্তত এক ডজন দেশে ঘুরেছে। অনেক আশ্চর্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি মেয়েটির। রসজ্ঞানও প্রচুর, জুড শুনছিলেন সেই বর্ণনাগুলি। এছাড়া দুজনের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পেলেন ডাক্তার। একই রকম বই তাদের ভালো লাগে। একই নাটক দেখেন তারা। মনের অবচেতন কোণে বহু বছর ধরে তিনি এমন একটি মেয়েকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত জুড ভাবলেন, আমি কি তা হলে অ্যানির প্রেমে পড়ে গেলাম?

অ্যানি ঘরে ঢুকল। জুড কৌচের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন।

অ্যানি বলল–আজ নিজের জন্য আসিনি। আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা, তাই এসেছি।

জুড নির্বাক হয়ে অ্যানির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গত দু-দিন ধরে তার সমস্ত অনুভূতিগুলি নিয়ে কে বা কারা ছিনিমিনি খেলা খেলেছে। সামান্য একটু সমবেদনার ছোঁয়া পড়তেই আলোড়ন উঠল। দুরন্ত আবেগের ঢেউ যেন জুডকে এপার ওপার করে দিল। ইচ্ছে হল সবকিছু উজার করে দেবেন। কিন্তু তা অসম্ভব। তিনি একজন চিকিৎসক। অ্যানি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।

অ্যানি দাঁড়িয়ে রইল। জুড কোনো কথা বললেন না।

অ্যানি বলল ক্যারলকে আমার খুবই ভালো লাগত। কে এমন কাজটা করল?

–জানি না।

–পুলিশ কাউকে সন্দেহ করেনি?

করেনি আবার, জুড মনে মনে ভাবলেন। যদি জানতে পারে–অ্যানিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বললেন, ওরা কতগুলো যুক্তি খাড়া করেছে।

–আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আমারও খুব খারাপ লাগছিল। আজ আপনি অফিসে আসবেন কিনা আমি ভাবছিলাম।

–আসবই না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসতে হল, যখন আপনি এলেন তখন একটু আলোচনা হোক না।

অ্যানিকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে আলোচনার কিছু নেই।

জুডের হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুত হয়েছে। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, হায় ভগবান, ও যেন না বলে বসে, এখন থেকে আর আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে না।

–আগামী সপ্তাহে আমি স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার মহামূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করে গেলাম। এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

–না-না, এরকম ভাবে বলবেন না। জুড অনুভব করলেন, তার গলা কাঁপছে। হাত ব্যাগ খুলে কিছু খুচরো নোট বের করল অ্যানি। জুডের দক্ষিণা সবটাই নগদে মেটায়। অন্যদের মতো চেকে দেয় না।

জুড বললেন–আজ আপনি আমার বন্ধু হিসেবে এসেছেন, এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই, আপনি আরও একবার এখানে আসুন।

–কেন? অ্যানি শান্ত চোখে তাকাল।

–আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটা আমরা আর একবার খতিয়ে দেখব। আর একটু আলোচনা করে দেখতে হবে আপনার সত্যি কোনো সমস্যা আছে কিনা।

দুষ্টুমি মাখানো হাসি হাসল অ্যানি।

–এবার এলে তা হলে স্নাতক উপাধিটা পেয়ে যাব বলছেন?

–সে যাই বলুন, জুড মুখে হাসি ফোঁটাবার চেষ্টা করলেন, ওটা পাবার জন্য আসবেন

–আপনি চাইলে আসতেই হবে, অ্যানি উঠে দাঁড়াল, আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ আপনাকে দিইনি, কিন্তু আমি জানি আপনি খুব ভালো ডাক্তার। যদি কখনও সাহায্যের দরকার হয়, কথা দিচ্ছি, আপনার কাছে আসব।

অ্যানির বাড়ানো হাতটা ধরলেন জুড। উঃ, ঘন একটি আলিঙ্গন, সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের শিহরণ। আশ্চর্য, অ্যানির এতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন না।

–আমি শুক্রবারে আসব।

–শুক্রবার? আচ্ছা।

করিডরের দরজা খুলে অ্যানি বেরিয়ে গেল। আরাম কেদারাতে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন। জুড। মনে হল, এই বিরাট পৃথিবীতে তিনি সত্যি সত্যি একা।

.

পাঁচ

সাতটার সময় শেষ রোগীটি চলে গেল। জুড মদের আলমারী খুললেন। কড়া স্কচ নিয়ে গলায় ঢেলে দিলেন। পাকস্থলীতে একটা তরল আগুনের পরশ পেলেন। হঠাৎ তার মনে হল, সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ কোনো কিছুই করা হয়নি। খাবার কথা মনে

হতেই আরও অসুস্থ বোধ করতে থাকলেন। মনকে অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। খুন দুটো বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ একইভাবে বসে রইলেন। গত দুদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছায়াছবির মতো এগিয়ে চলেছে। অবশেষে কোনো সমাধানে আসতে পারলেন না। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন, আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে।

চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাত নটা বেজে গেছে। লবিতে নামতে বরফ ঠান্ডা হাওয়ার কাঁপুনি লাগল মুখে। তুষারপাত শুরু হয়েছে। তুষারের কণাগুলো আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরটাকে দেখাচ্ছে ক্যানভাসে আঁকা তেল ছবির মতো। আকাশ চুম্বী অট্টালিকার মাথা থেকে রাস্তার ধূসর আর সাদা তরল গড়িয়ে পড়ছে। লেক্সিংটন এভিনিউর একটি দোকানের কাঁচের জানলায় লেখা আছে–বড়োদিন। জুড সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

পথঘাট একেবারে ফাঁকা। একজন পথচারী একলা হেঁটে চলেছে অনেক দূরে। হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। প্রেমিকা বা স্ত্রীর কাছে যাবার তাড়া আছে কি? অ্যানি এখন কী করছে? হঠাৎ জুডের অ্যানির কথা মনে পড়ল। হয়তো স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। নাকি শুয়ে পড়েছে ওরা?

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাঁপটা। একটা গাড়িও রাস্তায় বেরোয়নি। জুড মোড়ের আগেই রাস্তা পার হলেন। মাঝ বরাবর আসতেই একটা শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। দশ ফুট দূরে বিরাট একটা কালো লিমুজিন। হেডলাইট নিভিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে। একটা পাঁড় গদর্ভ, জুড ভাবলেন। ফুটপাথের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এলেন। তারপর দেখলেন,

গাড়িটা তার দিকেই ছুটে আসছে। উপলব্ধি করলেন, ওটা জেনে শুনে তাকে চাপা দিতে চাইছে।

শেষ যে ঘটনা তিনি মনে করতে পেরেছিলেন তা হল, ভারী কোনো বস্তু তাঁকে আঘাত করেছিল। তারপর বজ্রপাতের মতো একটা শব্দ। অন্ধকার রাস্তাটা এক-মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে ওঠে। জুড সব কিছু জানতে পারলেন। জন হানসেন আর ক্যারল রবার্টসের মৃত্যুর রহস্যভেদ করতে পারলেন। জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল তার। ম্যাকগ্রেভিকে জানাতে হবে। আলো নিভে এল। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেলেন তিনি।

উনিশ নম্বর থানাটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অতি প্রাচীন। রোদ-বাতাস-বৃষ্টিতে বোধহয় একটা ভাঙা বাড়ি। অঙ্গের প্লাসটার খসে গেছে। বাদামি ইট বেরিয়ে পড়েছে।

কার্নিসগুলো সাদা ঢিবি। পায়রার দল এই ঢিবিগুলো বানিয়েছে। একদিকে উনষাট থেকে। ছিয়াশি নম্বর স্ট্রিট। অন্য দিকে ফিফথ এভিনিউ থেকে রিভার সাইড-এই থানার এক্তিয়ারে পড়ে।

দশটার কয়েক মিনিট বাদে হাসপাতাল থেকে জানানো হল গাড়ি চাপা দিয়ে কেউ। একজন পালিয়ে গেছে। থানার কাজের চাপ সেদিন খুবই বেশি। আবহাওয়া খারাপ হলে। কী হবে, অনেকগুলো ধর্ষণ আর প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। ফাঁকা রাস্তায় লুটেরার দল বেরিয়ে পড়েছে। পথচারীদের হাতে যা আছে সর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছে।

বেশির ভাগ গোয়ন্দা তদন্তের কাজে রাস্তায় ব্যস্ত। বিভাগটা প্রায় ফাঁকা। ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলি এক সার্জেন্টকে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল।

অ্যাঞ্জেলি ফোনটা ধরল, সিটি হাসপাতালের এক নার্সের ফোন–লেফটন্যান্ট ম্যাকগ্রেভির সঙ্গে লোকটা দেখা করতে চাইছে। ম্যাকগ্রেভি তখন ইনফরমেশন সেন্টারে বসে আছে। অ্যাঞ্জেলি জানিয়ে দিল, ম্যাকগ্রেভি ফিরলে খবরটা তাকে বলা হবে।

রিসিভার নামানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকগ্রেভি ঘরে ঢুকল। অ্যাঞ্জেলি সব কিছু বলল। বলল–আমার মনে হয়, এখনই হাসপাতালে যেতে হবে।

–ও এখুনি মরছে না, আমি আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে চাই, অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছে।

অ্যাঞ্জেলি ভাবতে থাকল, ক্যাপ্টেন বারটেলি তাদের কথাবার্তার কোনো ইঙ্গিত ম্যাকগ্রেভিকে জানিয়ে দেবে কিনা?

–লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি খুবই দক্ষ লোক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অ্যাঞ্জেলি বলেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার প্রভাব তার ওপর পড়েছে।

ক্যাপ্টেন বারটেলি বলেছিলেন–আপনি কি ডাঃ স্টিভেন্সকে জড়ানোর জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে চাইছেন।

–অভিযোগ তো আমি করছি না ক্যাপ্টেন, শুধু ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

–বেশ, আমি জেনে নিলাম।

ম্যাকগ্রেভির খুনের কথাবার্তা চলল তিন মিনিট। এর মধ্যে সারাক্ষণ ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করতে করতে সে কিছু লিখল। দশ মিনিট পর তারা হাসপাতালের দিকে রওনা হল।

.

জুডের ঘরটা ছতলায়। লম্বা, নির্জন করিডোরের শেষ প্রান্তে। নার্স সেই ঘরে দুজনকে পৌঁছে দিল।

ম্যাকগ্রেভি প্রশ্ন করল–সে কেমন অবস্থায় আছে জানেন?

মেয়েটি বলল–ওটা ডাক্তারবাবু ভালো বলতে পারবেন। লোকটা যে মরেনি, এটা ভগবানের দয়া। সম্ভবত মাথায় চোট লেগেছে, পাঁজরার হাড় ভেঙেছে, বাঁ হাতটা ভীষণভাবে জখম হয়েছে।

অ্যাঞ্জেলি জানতে চাইল-জ্ঞান আছে?

–হ্যাঁ, তবে ওকে বিছানায় শুইয়ে রাখাটাই সমস্যা। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উনি পাগল হয়ে উঠেছেন।

ওরা ঘরে ঢুকল। সব কটা বিছানা ভর্তি, এককোণে পর্দা টানা একটা খাট। ম্যাকগ্রেভি আর অ্যাঞ্জেলি সেদিকে এগিয়ে গেল।

জুড বিছানাতে শুয়ে ছিলেন। মুখ রক্তশূন্য। কপালে বিরাট প্লাস্টার। বাঁ হাতে প্লাস্টার।

ম্যাকগ্রেভি মুখ খুলল–আপনার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনলাম?

জুডের গলা অসম্ভব দুর্বল–কেউ আমাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

–কে সে? অ্যাঞ্জেলির প্রশ্ন।

–তা জানি না তো, ব্যাপারটা তাই।

জুড ম্যাকগ্রেভির দিকে ফিরে বললেন–ওরা জন হ্যানসেন বা ক্যারল, কাউকেই খুন করতে চায়নি, চেয়েছিল আমাকে মারতে।

হ্যানসেন মরেছে, কারণ তার গায়ে তখন হলুদ রেনকোটটা ছিল। ওরা নিশ্চয়ই ওই রেনকোটটা পরে আমাকে অফিসে ঢুকতে দেখেছিল।

–এটা হলে হতে পারে, আঞ্জেলি মন্তব্য করল।

ম্যাকগ্রেভি বলল–অবশ্যই, তারপর ওরা যখন জানতে পারে যে, ভুল লোককে মেরে ফেলা হয়েছে, তখন আপনার অফিস ঘরে ঢুকে আপনার পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করে। ওগুলো খুলে ফেলার পর যখন আবিষ্কার করে, আপনি আসলে একটা মেয়েছেলে, তখন রেগে গিয়ে আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

–ক্যারল মরল এই কারণে যে, ওরা আমাকে খুঁজতে এসে তাকে সামনে পেয়ে গিয়েছিল।

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা লেখা কাগজ বের করে আনল ম্যাকগ্রেভি।–যে থানা এলাকাতে অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে, সেখানকার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি।

–ওটা অ্যাকসিডেন্ট ছিল না।

–পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী আপনি বেআইনিভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। আপনি কোণাকুণি রাস্তার মাঝখান দিয়ে পার হচ্ছিলেন।

–কোনো গাড়ি ছিল না।

–একটা গাড়ি ছিল। আপনি সেটা দেখতে পাননি। আপনি হঠাৎ রাস্তায় নেমে পড়তে সেই গাড়িটা ব্রেক কষে। চাকা পিছলে যেতে আপনার সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

–ঘটনাটা সে ভারে ঘটেনি, তাছাড়া হেডলাইট নেভানো ছিল।

–আপনি বলতে চান, সেটাই হ্যানসেন এবং ক্যারল রবার্টসের হত্যার প্রমাণ?

–কেউ যে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

–এতে কাজ হবে না ডাক্তার।

–কীসে কাজ হবে না বলছেন?

–সেই ভুতুরে লোকটার সন্ধানে আমি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াব। আর, আপনি নিজের হাত থেকে সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলবেন তাই তো?

ম্যাকগ্রেভির কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ঝরছে–আপনার রিসেপসনিস্ট যে অন্তঃসত্ত্বা ছিল সে খবর আপনি জানেন?

জুড মাথাটা বালিশের আরো গভীরে ঢুকিয়ে দিলেন। তাহলে? তাহলে ক্যারল এই খবরটা তাঁকে জানাতে চেয়েছিল? তিনি কিছুটা অনুমান করেছিলেন। চোখ খুলে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন–না। আমি জানতাম না। মাথাটা দপদপ করতে শুরু করেছে। গায়ের ব্যথাটাও ফিরে এল। বমির আবেগ চাপতে ঢোক গিলতে শুরু করলেন।

ম্যাকগ্রেভি বলল–সিটি হলে সরকারি নথিপত্রের ফাইলগুলো দেখছিলাম। যদি বলি আপনার অন্তঃসত্ত্বা রিসেপসনিস্টই আপনার কাছে কাজে ঢোকার আগে একটা পুরুষ খেকো মেয়েছেলে ছিল তাহলে কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? ডাঃ স্টিভেন্স, ওর পাস্ট হিস্ট্রি আপনি জানতেন তো, উত্তর আপনাকে দিতে হবে না। আমি আপনার হয়ে উত্তর দেবোচারবছর আগে প্রকাশ্য রাস্তায় পুরুষ মানুষকে প্রলোভন দিয়ে ডাকার অভিযোগ ছিল ওর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হবার পর কোর্ট থেকে ওকে আপনি ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ভাবুন তো? বাজারের একটা বেশ্যা মেয়েছেলেকে আপনি রিসেপসনিস্ট করে আনলেন কেন?

জুড গম্ভীর হয়ে বললেন–বেশ্যা হয়ে কেউ জন্মায় না, ষোলো বছরের একটা মেয়েকে। আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছিলাম।

–সেই সঙ্গে নিজের যৌনতৃপ্তির ব্যবস্থাও করেছিলেন এবং নিখরচায়, তাই তো? ম্যাকগ্রেভির ঠোঁটের কোণে এবার দুষ্টু হাসির চিহ্ন।

–আপনার মন ভীষণ সংকীর্ণ।

আরো একবার ম্যাকগ্রেভি হাসলো কৌতুকহীনভাবে–সে রাতে কোর্ট থেকে ওকে উদ্ধার করে কোথায় তুলেছিলেন?

–আমারই ফ্ল্যাটে।

–ওখানেই সে ঘুমিয়েছিল?

–হ্যাঁ।

ম্যাকগ্রেভি এবার দাঁত বের করে হাসলো। জবাব নেই আপনার। কোর্ট থেকে একটা সুন্দরী বেশ্যাকে তুলে নিয়ে গেলেন রাত কাটাবার জন্য। কিসের খোঁজে আপনি বেরিয়েছিলেন? দাবার সঙ্গীর? ওর সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থেকেছেন, একসঙ্গে শোননি, তাহলে আপনি কি সমকামী? আর যদি ব্যাপারটা তা হয়, যদি খাপে খাপে মিলে যায় তাহলে বলুন তো? হ্যাঁ, জন হ্যানসেন, আবার অন্যদিকে আপনি যদি ক্যারলের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে

গল্প করে থাকেন তাহলে ওর শেষ পরিণতিটা আপনারই হাতে থাকছে, তাই নাকি? বলুন? এবার কি আপনার বানানো উন্মাদের গল্পটা আমাকে মেনে নিতে হবে?

ম্যাকগ্রেভি বেরিয়ে গেল। জুডের মনে হল কেউ বোধহয় তার মাথাটা ছিঁড়ে নিচ্ছে।

অ্যাঞ্জলি বলল–আপনার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

–ওরা আমাকে হত্যা করতে চায় আমাকে সাহায্য করতে হবে।

–আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য?

–আমার জানা নেই।

–আপনার কোনো শত্রু আছে?

–না।

–কারার স্ত্রী বা বান্ধবীর সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্ক আছে কি?

–না।

–ধরুন সম্পত্তির জন্য কেউ আপনাকে সরিয়ে ফেলতে চায়।

–না।

অ্যাঞ্জেলি বলল–আর আপনার রোগীরা, ওদের একটা লিস্ট দিন তো তদন্ত করে দেখা যাক।

–সেটা সম্ভব নয়।

–আমি কেবল নামগুলো জানতে চাইছিলাম।

–দুঃখিত, আমি দাঁতের ডাক্তার বা হাতের রেখা বিশারদ হলে দিতে পারতাম। কিন্তু দেখতেই পারছেন ওরা ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়ে আমার কাছে আসে। আমার একটা গুড অব কনডাক্ট আছে। অনেকের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের ব্যাপার আছে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে ওরা বিব্রত হবে। আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আর কোনোদিন ওদের আমি চিকিৎসা করতে পারবো না।

অ্যাঞ্জলি প্রশ্ন করলো–যে লোক মনে করে সবাই তাকে হত্যা করতে চাইছে সেই লোকটি নিশ্চয়ই অসুস্থ, তা আপনি মানেন তো?

জুড বলে ওঠেন–হ্যাঁ, তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছে। আপনি কি ভাবছেন আমি সেই দলের সদস্য?

–নিজেকে আমার জায়গায় বসিয়ে একটু ভাবুন তো? আমি এখন বিছানায় শুয়ে আছি, আর আপনার মতো বলছি তাহলে কি হতো?

অ্যাঞ্জেলি বলতে থাকে, আমি যাই, ম্যাকগ্রেভি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জুড বললেন আমি যা বলছি তা প্রমাণ করার একটা সুযোগ আমাকে দেবেন কি?

–কিভাবে? যেতে যেতে জানতে চাইলো অ্যাঞ্জেলি।

–যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, সে নিশ্চয়ই আবার সুযোগের সন্ধানে থাকবে। আমি চাই পরবর্তী সময়ে আপনারা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলুন।

–দেখুন ডঃ স্টিভেন্স, যদি সত্যি সত্যি কেউ আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত পুলিশ বাহিনী আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। আজ অথবা কাল তারা সাফল্য পাবে। আপনি রাষ্ট্রপতি অথবা মহারাজ বা হ্যাঁরীসাহেব হোন না কেন, কোনো তফাৎ হবে না। আমাদের জীবনটা ঠিক একটা পাতলা সুতোর মতো, ওটা ছিঁড়তে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

–তাহলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, তাই তো?

–কেবল কয়েকটা ছোট্ট উপদেশ দেবো, আশা করি মানবেন। ফ্ল্যাটের দরজার তালাটা পাল্টাবেন। নতুন তালা লাগাবেন। জানলাগুলো বন্ধ করার পর দেখবেন ছিটকিনি লাগানো হয়েছে কিনা। অচেনা কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। এমন কি কোনো দোকান কর্মচারিকে পর্যন্ত নয়।

জুড মাথা নাড়লেন।

–দারোয়ান ও লিফট চালকের ওপর বিশ্বাস আছে তো?

–দারোয়ান দশ বছর ও বাড়িতে কাজ করছে। লিফটম্যানেদেরও আট বছর হয়ে গেল। ওদের আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

অ্যাঞ্জেলি বলল–ওদের বলবেন চোখ খোলা রাখতে। ওরা সতর্ক থাকলে কেউ লুকিয়ে আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবে না, আর অফিসের কি অবস্থা? নতুন কোনো রিসেপসনিস্ট নিচ্ছেন নাকি?

জুড ক্যারলের চেয়ারে অন্য একটি মেয়েকে কল্পনা করলেন। অসহায় গলায় বললেন না এখুনি কাউকে নিচ্ছি না।

–একজন পুরুষ মানুষকে ওই জায়গায় নিতে পারতেন।

–পরে ভেবে দেখবো।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাঞ্জেলি বলল–আমার মাথায় একটা কথা এসেছে। যদিও সেটা সুদূর প্রসারী। ম্যাকগ্রেভির পার্টনারকে যে খুন করে...

–হ্যাঁ, জিফরেন।

–সে কি সত্যিই উন্মাদ ছিল?

–হ্যাঁ। ওরা তাকে স্টেটস হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মানসিক রোগগ্রস্ত অপরাধীদের ওখানে রাখা হয়।

–বিনা কারণে ওখানে পাঠানোর জন্য আপনার ওপর কোনো দোষারোপ করা হয়নি তো? লোকটা ছাড়া পেয়েছে কিনা আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখবো। সকালের দিকে একবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

জুডের গলায় কৃতজ্ঞতা–ধন্যবাদ।

–ধন্যবাদের কিছু নেই, এটাই আমার কাজ। আর যদি জানতে পারি আপনি আমাকে ভাওতা দিয়েছেন তাহলে...

এক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলি–জিফরেন সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছি। এ ব্যাপারটা ম্যাকগ্রেভিকে জানাবার দরকার নেই।

.

অ্যাঞ্জেলি চলে গেল। আবার একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হলেন জুড। ব্যাপারটা ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই তার গ্রেপ্তার হয়ে যাবার কথা। তিনি জানেন ম্যাকগ্রেভি এত সহজে রেহাই দেবেন না। সে চায় প্রতিহিংসা। এমনভাবে তা নিতে চায় যাতে সাক্ষ্য প্রমাণ সব কিছু থাকে। গাড়ি চাপা দেবার ব্যাপারটা কি দুর্ঘটনা? তুষারে চাকা পিছলে যাওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু হেডলাইটগুলো নেভানো ছিল কেন?

জুড নিশ্চিত, আক্রমণ করার জন্যই ওরা এসেছিল, ভবিষ্যতে আবার করবে। ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে পিটার আর নোরা হ্যাডলি হাসপাতালে এলেন। সকালবেলা রেডিওতে খবর শুনে তারা ছুটে এসেছেন।

পিটার হ্যাডলি বললেন–তোমাকে ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছে।

নোরা জুডের হাতে একতোড়া ফুল তুলে দিলেন রাস্তায় আপনার জন্য কিনলাম।

পিটার সবকিছু জানতে চাইলেন। সব শুনে নোরা শিউরে উঠলেন। জুডের গলা খুঁজে এল। পুলিশ কিরকম চেষ্টা চালাচ্ছে পিটার জানতে চাইলেন।

কাগজে দেখা গেল লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি একজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য স্থির করে রেখেছেন। এই ব্যাপারটাও পিটার জানতে চাইলেন।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ক্যারলের প্রসঙ্গ প্রত্যেকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। পিটার আর নোরা জানতেন না যে হ্যানসেনও ছিলেন জুডের রোগী। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ম্যাকগ্রেভি তার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ করেননি।

হ্যারিসন বার্ক-এর কথাও পিটারকে জানানো হল।

পিটার হ্যাডলি উঠতে উঠতে বললেন–দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম কেসটা হয়তো তোমার আয়ত্তের বাইরে যায়নি। এখন দেখছি ওটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

–এখান থেকে বেরিয়ে কেসটা ছেড়ে দেবো।

–দরকার পড়লে আমাকে খবর দিও কেমন?

শুয়ে শুয়ে জুড ভাবতে থাকলেন অনেক কিছু। তাকে হত্যার প্রচেষ্টার পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? এমন কি কেউ আছে যে মানসিক ভারসাম্যহীন? হ্যারিসন বার্ক আর আমোস জিফরেন আর কেউ? সহসা জুড অনুভব করলেন, মনটা ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। করার মতো কিছু একটা কাজ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। হাসপাতাল থেকে এখুনি বেরোতে হবে।

ফোন তুলে নার্সকে জানালেন ডাঃ হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করবেন।

দশমিনিট বাদে ডাঃ সিমূর হ্যারিস এলেন। ছোট্ট চেহারা, থুতনিতে খোঁচা দাড়ি। জুডের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়।

–বাবাঃ, এই তো ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। চেহারার যা হল করেছে।

–আমি ভালোই আছি। এখান থেকে চলে যাব বলে আপনাকে ডেকেছি।

–কখন?

–এখনই।

ডাঃ হ্যারিস তাকালেন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে–কেন আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলে কি বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যেত? চাও তো কয়েকজন সুন্দরী নার্সদের পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার পরিচর্যার জন্য?

–ধন্যবাদ আমার যাওয়াটা খুবই দরকার।

–বেশ, নিজের ডাক্তারী নিজেই কর।

–মিস বেডপ্যাসকে বলছি তোমার পোশাকগুলো দিয়ে দিতে।

আধঘণ্টা বাদে মেয়েটি ট্যাক্সি ডেকে দিল। ঠিক সোয়া দশটাতে জুড পৌঁছে গেলেন তার অফিস ঘরে।

প্রথম রোগী

ছয়

টেরি ওয়াশবার্ন, প্রথম রোগী, করিডোরে অপেক্ষা করছিলো। কুড়ি বছর আগে হলিউড চিত্রজগতে এক সাড়া জাগানো নাম। অভিনেত্রী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বিস্ময়কর ভাবে। ওরিগনের এক কাঠচেরাই ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিলেন। সবকিছু ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে যায়। এটাই অবশ্য প্রথম নয়, তারপর পাঁচ-ছবার বিয়ের কনের সেজেছিল সে। সব শেষে যে স্বামীর সঙ্গে নিউইয়র্কে বাস করছে সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী।

জুডকে দেখে রাগে কাঁপতে কাঁপতে টেরি উঠে দাঁড়ালো–শেষপর্যন্ত এসেছেন, জুডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সে। কি হয়েছে আপনার? মনে হচ্ছে কোনো শিং-ওয়ালা। জন্তু আপনাকে গুতিয়ে দিয়েছে?

–ছোটো খাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, মাফ করবেন দেরি হয়ে গেছে।

–ক্যারলের কথা পড়লাম। ওটা কি সেক্স মার্ডার?

–না। জুড দরজা খুললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি দশ মিনিটের মধ্যেই ডেকে পাঠাচ্ছি।

চেয়ারে বসে জুড ডেক্স ক্যালেন্ডারে নামের তালিকা পড়ে নিলেন। ফোন তুলে একের পর এক ডায়াল ঘুরিয়ে রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বাতিল করলেন। ফোন রাখলেন। টেরিকে প্রথমে ডেকে পাঠালেন।

টেরি ঘরে ঢুকে কৌচের ওপর শুয়ে পড়ল। স্কার্টটা উঠে গেল। উরুর অনেকখানি, অনাবৃত করে দিল।

একসময় সে ছিল সত্যিকারের সুন্দরী। সেই সৌন্দর্যের রেশ এখনও অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোর মতো উদ্ভাসিত। মানুষের চোখ যে কি করে এত আবেদনময়ী হয়ে উঠতে পারে জুড তা জানেন না। নরম দুটি চোখে চির সরলতার চাউনি। মুখে দু-একটা ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু আজও ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয়। আজও ওর পীনোন্নত বুক আর নিতম্বের হিল্লোল যে কোনো পুরুষের মনে কামনার সঞ্চারণ ঘটাতে পারে। জুডের মনে হল ও বোধহয় সিলিকন ইঞ্জেকসন নিয়ে এসেছে, কিন্তু জুড সেকথাটা প্রকাশ । করলেন না। কথাটা তিনি ওর মুখ থেকেই শুনতে চান।

জুডের অধিকাংশ রোগীনীদের মনের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে ডাক্তরবাবু তাদের প্রেমে পড়ে গেছেন। কিন্তু টেরির ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। এখানে এসেই জুডের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। ও যে এ বিষয়ে কত দক্ষ তা প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। জুডকে প্রলোভিত করার জন্য নারীত্বের যাবতীয় ছলাকলা প্রয়োগ করেছে। অবশেষে জুড নিরুপায় হয়ে ওকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বলেছেনস্বভাব না পাল্টালে তিনি ওকে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এরপর টেরি অনেকটা সংযত করেছে নিজেকে।

এক বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক মারফত এই কেসটা জুডের কাছে এসেছে। একটি জঘন্য আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারিতে টেরির নাম জড়িয়ে পড়েছিল। তাই ভদ্রলোক টেরির চিকিৎসা করতে চাননি। টেরি তখন এক জাহাজ ব্যবসায়ীকে ভালোবাসে। সেই সময় ফরাসী চুটকি পত্রিকায় খবর বেরোলো, ব্যবসাসূত্রে ব্যবসায়ীটি একদিনের জন্য রোমে গিয়েছিল। টেরি একটা পালতোলা নৌকো ভাড়া করে। হবু স্বামীর তিন ভাইয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যৌনসংযোগ করে। ব্যাপারটা অবশ্য ধামাচাপা দেওয়া হয়। এমনকি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই খবর প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। জুডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই টেরি সব স্বীকার করেছিল।

টেরি বলেছিল–ওঃ, সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা, সেক্স ছাড়া আমি একমুহূর্ত থাকতে পারি না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য মনের মতো পুরুষ পাই না।, হাত ঘষতে গিয়ে স্কার্টটা ওপরে তুলে ধরেছিল। নিতম্বের বেশ খানিকটা অনাবৃত করে দিয়েছিল। তারপর দেখলো জুড সেদিকে তাকাচ্ছেন না। সে বলেছিল, আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন কি?

প্রথম দিনেই জুড ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিলেন। পেনিসিলভিনিয়ার কয়লাখনি ঘেরা ছোট্ট একটা অঞ্চলে ও জন্মেছিল। ওর বাবা ছিল খনি মজদুর। প্রতি শনিবার পাঁড় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতো। মাকে গালাগাল দিতো। মারধোর করতো।

তের বছর বয়সেই পূর্ণযুবতী হয়ে ওঠে টেরি। মুখে দেখা দেয় পরীর সৌন্দর্য। এক সময় ও জানলো খনি মজদুরদের অবসর সময়ের সাথী হলে বেশ কিছু পয়সা রোজগার হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা বাবার মগজে ঢুকে যেতে বিপদ হল। একদিন রাতে লোকটা

আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ি ফিরলো। মাকে চুলের মুঠি ধরে তাড়িয়ে দিলো। ভিতরের থেকে দরজা বন্ধ করে টেরিকে মারতে শুরু করলো, তারপর ধর্ষণও করলো নিজের মেয়েকে।

কৌচে শুয়ে শুয়ে টেরি এইসব বর্ণনা দিচ্ছিল। জুড তখন এক দৃষ্টিতে টেরির আবেগ শূন্য মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

–আমার মা বাবার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

–আপনি পালিয়ে গেলেন? জুড আবার বললেন–বলছিলাম কি আপনার বাবা যৌনসংযোগ করার পর

–পালিয়ে গেলাম?

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে বাঁধ ভাঙ্গা হাসিতে ফেটে পড়েছিল মেয়েটি। বলেছিল–বলছেন কি? ব্যাপারটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। আমার ডাইনি মা-টাই তো ওখানে থাকতে দিল না আমাকে।

জুড সুইচ টিপে টেপ রেকর্ডার আবার চালু করলেন। বলুন, আজ কি নিয়ে আলোচনা হতে পারে?

টেরি হেসে বলল–কেন আমরা সেই কথাটাই জানতে চাইছি? আপনি এত সরল তাই নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে কেমন হয়?

জুড অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন ক্যারলের মৃত্যুটাকে সেক্স মার্ডার বলে মনে হচ্ছে কেন?

–আমি সবকিছুর মধ্যে সেক্স খুঁজে পাই। দেহটা মোচড় দিল সে। অকারণে স্কার্টটা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেল।

–পোশাকটা ঠিক করে নিন।

টেরি গোবেচারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল–ওঃ সরি, ডাক্তারবাবু আপনি কিন্তু শনিবার একটা পার্টি মিস করলেন।

–বলুন না আপনার মুখ থেকেই শোনা যাক।

টেরি কিছুটা দ্বিধা করে বলল–শুনলে আমাকে ঘেন্না করবেন নাকি?

ওর বলার ভঙ্গিমাটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল জুডের। জুড বললেন–আমি তো আগেই বলেছি, আপনি যা মনে আসবে তাই বলবেন। আমার মতামতের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনার নিজের বিচারটাকেই প্রাধান্য দেবেন।

একটুক্ষণের নীরবতা। টেরি বলল ওটা ছিল প্রকাশ্য পার্টি। আমার স্বামী আমাকে একটা মেসিন ব্যান্ড এনে দিয়েছে। ওটা কি জিনিস জানেন তো?

মুখে সরলতার চিহ্ন এনে জুড জানতে চাইলেন–কি জিনিস?

এবার খিল খিল হাসিতে হেসে উঠলো ওই অভিনেত্রীটি। তার শরীরের সবখানে হাসির হিল্লোল ছড়িয়ে পড়লো। জুড এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন। পুরুষ সত্ত্বা

হঠাৎ উথলে উঠলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। নাঃ, রোগীণীর সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়।

–ওটাতে নকল পুরুষাঙ্গ লাগানো থাকে। কোমরের সঙ্গে বেল্ট লাগিয়ে ইলেকট্রিক ক্যারেন্টে মেসিনটা চালু করতে হয়, পাশ ফিরে তাকিয়ে টেরি বলল–সব কথা বললে আমাকে ঘেন্না করবেন না তো?

–আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি, মিসেস ওয়াকা বার্ন। আমরা এমন কিছু কাজ করে থাকি যার জন্য আমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।

কৌচে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো টেরি আপনাকে বলেছিলাম না, হ্যারিকে আমি নপুংসক বলে সন্দেহ করি।

–হ্যাঁ।

–বলতে গেলে কোনোদিনই ও আমাকে সেই অর্থে ব্যবহার করেনি। সব সময় একটা একটা বাহানা দিয়েছে। শনিবার রাতে ওর সামনে ব্যান্ডটা ব্যবহার করলাম। হঠাৎ ও কি রকম যেন হয়ে গেল।

কাঁদতে শুরু করে টেরি, জুড, কাগজের রুমাল এগিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করেন–আপনাকে জল দেবো?

–না না। ঠিক আছে, টেরি উঠে বসে। ব্যাগ থেকে নিজের রুমালটা বের করে। নাক মুছে নেয় ও–ক্ষমা করবেন, বোকার মতো কাজটা করে ফেললাম। বুঝতে পারি না আমি কেন হ্যারির মতো একটা পুরুষকে বিয়ে করেছি।

–এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনার মতো অনেক নারী একই প্রশ্নের জালে বন্দীজীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

–কেমন করে বলবো? আপনি তো একজন সাইক্রিয়াটিস্ট, উত্তরটা আপনারই ভালো জানা আছে। আপনি কি মনে করেন আগে থেকে জানলে আমি কি একটা ক্লীবকে বিয়ে করতাম।

–আপনার কি তাই ধারণা?

–আপনি বলছেন, জেনেশুনেও আমি কি ওকে বিয়ে করতাম?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কৌচ ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে টেরি,– নোংরা মন আপনার। ভাবছেন ব্যান্ড কোমরে লাগাতে আমার খুব ভালো লাগে তাই তো?

–কেন ভালো লাগে না?

প্রচণ্ড রাগে উন্মত্ত হয়ে গেল মেয়েটি। জুডকে লক্ষ্য করে একটা ফুলদানী ছুঁড়ে মারলো। সেটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। টেবিলে লেগে ফেটে পড়লো-উত্তরটা পেলেন?

–ওটার দাম দুশো ডলার। আপনার বিলের সঙ্গে টাকাটা যোগ হবে।

–সত্যিই কি তাহলে ভালো লেগেছিল?

–আপনিই বলুন।

টেরি গলা নামিয়ে আনলো–আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। হায় ভগবান, আমি অসুস্থ জুড, আমাকে সাহায্য করুন।

জুড এগিয়ে এলেন, আপনাকে সাহায্য করতে গেল আমাকেও আপনার সাহায্য করা দরকার মিসেস ওয়াশ বার্ন। টেরি মাথা নাড়লো।

–আপনি বরং বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করুন। যখন ওই জিনিসটা ব্যবহার করবেন তখন ভাববার দরকার নেই। চিন্তা করুন তো? কি জন্য ওটা আপনাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে? যখন দেখবেন আপনার মনে আর কোনো চিন্তা নেই তখন বুঝতে পারবেন যে কত অজানা তথ্য আপনি জেনে ফেলেছেন।

মুখে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো। রুমাল দিয়ে মেয়েটি নাক মুছলো-ওঃ, আপনি যাদু জানেন। দস্তানা আর হাত ব্যাগ তুলে নেবার পর সে বলল–তাহলে আগামী সপ্তাহে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে কেমন?

–হ্যাঁ, আবার সামনের সপ্তাহে। জুড় করিডোরের দরজাটা খুলে দিলেন।

এই সমস্যার একটা সহজ সমাধান জুডের হাতে ছিল, কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই সমস্যাটা জিইয়ে রাখলেন। মেয়েটা নিজেই সমাধান খুঁজে নিক। ওর অনেক কিছু বোঝা দরকার,

ভালোবাসা যে কোনো সময়ে দাম দিয়ে কেনা যায় না। ভালোবাসা, আসে হঠাৎ হাওয়ার মতো। ওই অযাচিত বস্তুটি পাওয়ার আগে নিজের মূল্য উপলব্ধি করতে হবে।

ওর নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে থাকলেন তিনি। সীমাহীন হতাশা আর আত্মবিরাগ মেয়েটিকে এমন হৃদয়হীন করে তুলেছে। মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে টেরি এখন পার হচ্ছে।

টেপটা ঠিক জায়গাতে রেখে দিলেন জুড। নিজের সমস্যার কথা ভাবতে থাকলেন। অবিলম্বে উনিশ নম্বর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ম্যাকগ্রেভির থমথমে গম্ভীর গলা শোনা গেল–হ্যালো লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি বলছি।

–ডিটিকটিভ সার্জেন্ট অ্যাঞ্জেলিকে ডেকে দেবেন?

–একটু ধরুন।

অ্যাঞ্জেলির গলা–হ্যালো, আমি জুড স্টিভেন্স। খবরটা পেয়েছেন কি?

–আমি খোঁজ নেবো।

–কেবল না বা হ্যাঁ বললেই হবে।

অনেকক্ষণ পর তিনি পরবর্তী প্রশ্নটা করলেন–জিফরেন কি এখনও ওখানেই?

–হ্যাঁ।

–ও আচ্ছা।

–আমি দুঃখিত।

–ধন্যবাদ। আস্তে আস্তে তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বাকি রইলো হ্যারিসন বার্ক। বার্কের সন্দেহ সবাই তাকে হত্যা করতে চাইছেন। জন হ্যানসেন সোমবার দশটা পঞ্চাশ মিনিটে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিহত হন। এখন দেখতে হবে বার্ক সেই সময় কি করছিলেন? তিনি কি অফিসে ছিলেন? অফিসের নম্বর খুঁজে জুড ডায়াল করলেন।

–ইন্টারন্যাশনাল স্টিল। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

–মিঃ হ্যারিসন বার্ককে একবার লাইনটা দেবেন?

একটি মেয়ে সুরেখা কণ্ঠস্বরে বলল–মিঃ বার্কের অফিস। কে বলছেন?

–আমি ডাঃ জুড স্টিভেন্স। আমাকে কয়েকটা তথ্য জানাতে পারবেন?

–ও, ডাঃ স্টিভেন্স। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে স্বস্তি এবং শঙ্কা।

–আমি মিঃ বার্কের বিল সম্বন্ধে বলছি।

–বিল?

জুড দ্রুত বলতে থাকেন–আমার রিসেপসনিস্ট, ও আর নেই। খাতাপত্রগুলো আমি পরিষ্কার করে নিতে চাইছি। ওর খাতায় দেখছিলাম গত সোমবার সকাল সাড়ে নটায় মিঃ বার্কের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় লেখা আছে। সময়টা আপনি কি আপনার রেকর্ডের সঙ্গে চেক করে আমাকে জানাবেন।

–এক মিনিট, কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটি ফোন করলো-আপনার রিসেপসনিস্ট নিশ্চয় ভুল করে গেছেন ডাঃ স্টিভেন্স। মিঃ বার্ক সোমবার সকালে কখনই আপনার অফিসে যাননি।

–আপনি নিশ্চিত তো? খাতায় কিন্তু লেখা আছে নটা ত্রিশ থেকে...

–ওই খাতায় কি লেখা আছে তা নিয়ে আমার আদৌ মাথা ব্যথা নেই ডাঃ স্টিভেন্স।

মেয়েটা জুডের নির্বুদ্ধিতায় রেগে ওঠে–মিঃ বার্ক সারা সকাল স্টাফ মিটিং-এ ছিলেন। সকাল আটটা থেকে স্টাফমিটিং শুরু হয়েছিল।

–ঘণ্টাখানেকের জন্য কি ওখান থেকে বেরোনো যায় না।

–মিঃ বার্ক দিনের বেলায় কখনো অফিস থেকে বেরোন না। উনি ফিরলে কি বলবো যে আপনি ফোন করেছিলেন?

–কোনো প্রয়োজন নেই।

–তাহলে? ডাক্তার আবার অতল জলে নিমগ্ন। জিফরেন বা হ্যারিসন বার্কের মধ্যে কেউ তাকে হত্যার চেষ্টা করেন নি। তাহলে? পৃথিবীতে আর কে আছে?

ফোন বেজে উঠলো। রিসিভার কানে লাগালেন ডাক্তার। অ্যানির খসখসে গলাটা শোনা গেল–খুব ব্যস্ত?

–না, বলুন।

–শুনলাম আপনি নাকি গাড়ি চাপা পড়েছিলেন, অ্যানির গলায় উদ্বেগ-খবরটা শুনেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথায় পাবো বুঝতে পারিনি।

জুড হালকা চালে জবাব দিলেন–আরে না না, তেমন কিছু মারাত্মক নয়। ওই ঘটনাতে একটা শিক্ষা পেলাম, বেআইনীভাবে হাঁটতে নেই।

–কাগজে লিখেছে গাড়িটি ইচ্ছে করেই আপনাকে চাপা দিতে চেয়েছিল।

–ঠিকই লিখেছে।

–লোকটা ধরা পড়েছে?

–না, মনে হয় ওর মজা করার ইচ্ছে হয়েছিল।

হেডলাইট বন্ধ কালো লিমুজিনের ছবি ভেসে উঠলো জুডের মনের পর্দায়।

–ঠিক জানেন আপনি?

প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ অবাক হয়ে গেলেন জুড-হঠাৎ একথা কেন?

–কেন করছি তা আমি নিজেই জানি না। অ্যানির গলা রহস্যময়। ক্যারল মারা গেল, তারপর এই ঘটনা–।

দুটো ঘটনার যোগ তাহলে অ্যানিও করে নিয়েছে? জুড ভাবলেন।

–আমার মনে হয় কোনো বন্দী পাগল রাস্তায় নেমে পড়েছে।

জুড আশ্বাস দিলেন–যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আজ অথবা আগামীকাল পুলিশ তাকে ধরবেই।

–আপনার তেমন চোট লাগেনি তো?

–না। তেমন কিছু হয়নি।

অদ্ভুত একটা নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। দুপক্ষই কত কথা বলতে চাইছে কিন্তু কেউ কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না। নেহাত সৌজন্যের খাতিরে টেলিফোন, কোনো রোগী তার চিকিৎসক সম্পর্কে এটুকু কৌতূহল দেখাতেই পারে। কিন্তু অ্যানির ব্যাপারটা তো একেবারেই আলাদা। অপরিচিত মানুষ বিপদে পড়লে সে খোঁজ খবর নিতে।

–তাহলে শুক্রবার দেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন করার মতো কিছু একটা খুঁজে পেলেন জুড।

–ছাড়ি তাহলে? আচ্ছা।

অ্যানির কথা ভাবতে শুরু করলেন তিনি। ওর স্বামীকে কেমন দেখতে? ভদ্রলোককে সুপুরুষ এবং গম্ভীর বলেই মনে হয়। এককালে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। এখন নামকরা ব্যবসায়ী হয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করেছেন। কিন্তু ওর কি এমন সমস্যা যা স্বামীর সঙ্গেও আলোচনা করা সম্ভব হয় না? এমন কি পারিবারিক চিকিৎসকের কাছেও খুলে বলা যায় না? বিয়ের আগে কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি? মনে হয় শুক্রবার দিন ও মুখ খুলবে।

বিকেলটা তাড়াতাড়ি কাটলো। যেসব রোগীদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি তাদের দেখতে ডাক্তার বাধ্য হলেন। শেষ লোকটি বেরিয়ে গেল। তিনি । হ্যারিসন বার্কের টেপ চালালেন। মন দিয়ে শুনতে শুনতে কিছু লিখতে থাকলেন।

সবটা শুনে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন। হতাশায় আচ্ছন্ন হল মন। নাঃ, আর কোনো উপায় নেই। এবার ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বার্কের সর্বশেষ অবস্থাটা জানাতে হবে। হঠাৎ জানলার দিকে তাকালেন। অন্ধকার নেমে এসেছে। রাত আটটা বাজে। ক্লান্তি বোধ করতে থাকেন। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। পাঁজরটা কনকন করছে। হাতটাও অসম্ভব ভারী। বাড়ি গিয়ে গরম জলে স্নান করতে হবে।

বার্কের টেপটা টেবিলের দেরাজে রাখলেন। বাকিগুলো দেওয়ালের গর্তে ঢুকিয়ে দিলেন। টেপটা কোনো মনোবিজ্ঞানীর হাতে তুলে দিতে হবে। ওভার কোট চাপালেন। টেলিফোন বেজে উঠলো। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে ফোন তুললেন ডাঃ স্টিভেন্স।

কোনো উত্তর নেই, চাপা শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ।

–হ্যালো...

উত্তর না পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ভ্রু কুঁচকে উঠলো। ভুল নম্বর হয়তো। ঘুরে দাঁড়ালেন আলোগুলো নেভাতে হবে। বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সব ভাড়াটিয়ারাই চলে গেছে, রাতের শিট এখনও চালু হয়নি। দারোয়ান বিগলো বাদে সম্পূর্ণ বাড়িটাতে আর কোনো জনপ্রাণী নেই।

লিফটের পাশে এসে বোতাম টিপলেন। সংকেত মিটারের কাঁটাটা একটুও নড়লো না। আবার চাপ দিলেন। এবারও একই অবস্থা।

তখনই একটা অঘটন ঘটে গেল, করিডোরের সমস্ত আলোগুলো নিভে গেল একসঙ্গে।

.

সাত

নিচের তলায় আলো জ্বলছে ভেবে সন্তর্পণে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। ওটাও পুরো অন্ধকার। রেলিং ধরে সাবধানে নামতে শুরু করলেন। নিচতলায় টর্চের আলোর রশ্মি। দেখতে পেলেন। লিফটের সামনে জুড নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধকারের ঢেউ যেন চারপাশ থেকে তাকে আক্রমণ করছে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন তিনি। দেশলাইয়ের সন্ধানে পকেটে হাত ঢোকালেন। মনে পড়লো অফিসেই ওটা ছেড়ে এসেছেন।

অসহায় কাকুতি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে–বিগলো! আমি ডাঃ স্টিভেন্স ওপরে।

কণ্ঠস্বরটা সিঁড়ির দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। টর্চধারী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। আবার চিৎকার করলেন, কে আপনি? এবারও নিজের গলার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হঠাৎ তিনি ওই লোকটাকে চিনে ফেললেন। তার নিয়তি। একজন নয়, অন্তত দুজন। একজন বিদ্যুতের লাইন কেটেছে। অন্যজন সিঁড়িতে পাহারা দিয়েছে। যাতে তিনি এই পথে পালাতে না পারেন।

দু-তিন তলা তফাতে এসে টর্চ লাইটা এগোতে থাকলো। আতঙ্কে তখন তিনি একেবারে হিম হয়ে গেছেন। হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে চলেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। নির্দিষ্ট তলায় পৌঁছলেন। দরজা ফাঁক করে কান খাড়া করলেন। অন্ধকার করিডোরে কেউ তার অপেক্ষায় নেই তো?

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জুডের। অন্ধকারের মধ্যেই করিডোর দিয়ে তিনি ছুটছেন। মনের এই অবস্থাতে দরজাগুলো একটির পর একটি করে গুণতে লাগলেন। অবশেষে ঠিক জায়গায় পৌঁছলেন। দরজাটা খোলার শব্দ হল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে চাবির গোছটা মাটিতে পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে নিলেন। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হল নিজেকে। বিশেষ একটা চাবি ছাড়া দরজাটা বাইরে থেকে খোলা যাবে না।

কান পেতে থাকলেন। করিডোর দিয়ে পায়ের শব্দটা তখন ক্রমশ আরো কাছে এগিয়ে আসছে। সুইচ টিপলেন, খট করে শব্দ হল। আলো জ্বললো না, সারা বাড়িতেই বিদ্যুৎ নেই। টেলিফোনের কাছে গেলেন। অপারেটরের নম্বর ডায়াল করলেন।

জুড স্টিভেন্স বলছি, আমি উনিশ নম্বর থানার ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে কথা বলতে চাই। একটু তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?

দ্ব্যর্থহীন গলায় কে যেন বলল অপেক্ষা করুন একটু।

করিডোরের দিকের দরজাটাকে কেউ পরীক্ষা করছে জুড বুঝতে পারলেন।

লাইনে গুঞ্জন উঠলো–উনিশ নম্বর থানার ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলিকে দেবেন তাড়াতাড়ি – একটু ধরুন।

বাইরে থেকে চাপা গলার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। জুড শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

–হ্যালো ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি এখন নেই, আমি তার পার্টনার লেফটেন্যান্ট ম্যাকগ্রেভি বলছি।

–আমি জুড স্টিভেন্স আমার অফিস থেকে বলছি। এবাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে।

ম্যাকগ্রেভি বলল–শুনুন ডাক্তার আপনি বরং আমার এখানে চলে আসুন, আমরা আলোচনা করি।

জুড চেঁচিয়ে উঠলেন আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।

দরজা খোলার শব্দ হল। বাইরের ঘরে গলার আওয়াজ পেলেন। ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এই অসম্ভব ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হল। এবার ওরা তার ঘরে ঢুকবে।

ম্যাকগ্রেভি কিছু একটা বলে উঠলো। কিন্তু কথাগুলো জুড বুঝতে পারলেন না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। ম্যাকগ্রেভি আসতে রাজী হলেও বোধহয় দেরি লাভ হবে নক্যারলের

হ্যানসেন আর ক্যারলের মতো তিনি বিনা প্রতিরোধে মৃত্যুবরণ করবেন না। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করবেন। একটা মোক্ষম অস্ত্রের সন্ধানে চারপাশে হাতড়াতে থাকলেন। খামকাটা ছুরি, ছাইদানি, নাঃ ওরা নিশ্চয় বন্দুক নিয়ে এসেছে।

বড়ো জোর দুই-এক সেকেন্ড, দরজার হাতল ঘোরালো। দরজাটা যদিও ভেতর থেকে তালাবন্ধ কিন্তু সেই তালার কোনো মূল্য নেই। বাঁচার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে টেবিলটার পাশে নিজেকে আড়াল করে নিলেন। দরজায় ক্যাচ করে একটা শব্দ হল। তালাটা ওরা, ভেঙে ফেলছে না কেন? মনের অতল গভীরে কে যেন তাকে বলে দিল–এ উত্তরটা খুবই জরুরী। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করার সময় কোথায়। কাঁপা হাতে টেবিলের দেরাজ হাতড়ে হ্যারিসন বার্কের টেপটা বের করলেন। রেকর্ডারের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলেন মিঃ বার্ক, আমি খুবই দুঃখিত, ইলেকট্রিক চলে গেলো তবে চিন্তার কিছু নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা লাইন ঠিক করে দেবে। আপনি বরং ততক্ষণ আড়াল করে শুয়ে থাকুন।

দরজার শব্দটা থেমে গেল। জুড টেপ রেকর্ডারের একটা বোতামে চাপ দিলেন। পরক্ষণেই তার খেয়াল হল, আরে! বিদ্যুৎ না থাকাতে মেসিনটা তো অচল। মরিয়া হয়ে আবার বলে উঠলেন–ঠিক আছে, এখন শুয়ে থাকুন। সহসা একটা কথা খেয়াল হল। টেবিল হাতড়ে দেশলাই বের করলেন। বাতি জ্বালালেন। টেপ রেকর্ডারের–একটা বোতামের গায়ে ব্যাটারি কথাটা লেখা আছে। বোতামটাতে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল।

বার্কের কণ্ঠস্বর তখন ঘরে গমগম করছে–আমার প্রমাণগুলো তাহলে আপনি শুনতে চান না? কি করে বুঝবো আপনি ওদের দলে নেই?

জুড যেন বরফের মতো জমে গেলেন।

–সেটা আপনি ভালো বোঝেন মিঃ বার্ক। আমি আপনার বন্ধু। আপনাকে সাহায্য করতে চাই। ঠিক আছে, বলুন কি প্রমাণ আপনার হাতে আছে?

–ওরা কাল রাতে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছিলো আমাকে খুন করতে। কিন্তু আমি বোকা নই। প্রত্যেকটা দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছি। ওরা আমাকে ছুঁতে পারেনি।

বাইরের ঘরে শব্দ থেমে গেল।

টেপ রেকর্ডারে আবার জুডের গলা–তালা ভেঙে ঢোকার ব্যাপারটা জানিয়েছেন। পুলিশকে?

–কিসের জন্য জানাবো? ওরা তো ওদেরই দলের। ওদের বলা আছে, দেখলে যেন আমাকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে তো আর গুলি চালাতে পারে না। তাই আমি সব সময় তোকজনের মধ্যে দিয়ে হাঁটি।

–তথ্যটা দেওয়াতে আমি খুশি হলাম।

–এতে আপনার কি সুবিধে হবে?

–আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

সহসা তার ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল–থামাও! এর পরের কথাগুলোতে আছে সব টেপেও তুলে নেওয়া হচ্ছে।

প্রায় ঝাঁপ দিয়ে বোতামটা চেপে ধরলেন। বলে উঠলেন সব আমার মনের মধ্যে রইলোর আমরা এবার আলোচনা করে দেখবো কিভাবে সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। এ ধরনের কেস আমার কাছে অনেক আসে। উঃ, আলোগুলো যে কখন জ্বলবে। আপনার ড্রাইভার তো অপেক্ষা করে আছে। আপনি এতক্ষণ নামছেন না দেখে বেচারী চিন্তা করবে।

জুড কান খাড়া করলেন। ওপাশ থেকে ফিসফিসে গলা ভেসে আসছে। ওরা কি মতলব করছে কে জানে? রাস্তায় বহু দূর থেকে একটা সাইরেনের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। গলার আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। তবে কি ওরা বাইরে অপেক্ষা করবে? সাইরেনের আওয়াজটা একেবারে সামনে এসে থেমে গেল। নিশ্চয়ই বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে গেছে।

তারপর হঠাৎ আলোগুলো জ্বলে উঠলো।

.

আট

ড্রিংক?

জুডকে লক্ষ্য করে আপন মনে মাথা নাড়লেন ম্যাকগ্রেভি। স্কচের দ্বিতীয় গ্লাসটা জুড নিজেই ঢেলে নিলেন। দুটো হাত ভীষণ কাঁপছে। উষ্ণ পানীয়টা গলা দিয়ে নেমে গেলো।

ম্যাকগ্রেভি এল আলো জ্বলার ঠিক দুমিনিট পরে, তার সঙ্গে কাঠখোট্টা চেহারার একজন সার্জেন্ট এসেছিল। ম্যাকগ্রেভি বললেন–আপনার বক্তব্যগুলো একবার শোনা যাক।

জুড চাপা গলায় বলতে শুরু করলেনদরজায় তালা লাগিয়ে লিফটের কাছে গেছি, হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেলো। ভাবলাম, নিচের আলোগুলো নিশ্চয়ই জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে চোখে পড়লো কে একজন টর্চ হাতে ওপরে উঠে আসছে। মনে করলাম দারোয়ান বিগলো, কিন্তু সে নয়।

–কে ছিলো?

–আগেই বলেছি আমার জানা নেই। চেঁচিয়েও ওদের কাছে সাড়া পাইনি।

–কি করে বুঝলেন ওরা আপনাকে হত্যা করতে এসেছে?

কড়া একটা জবাব ছিল ঠোঁটের ডগায়, জুড নিজেকে সংযত করলেন। ম্যাকগ্রেভির মনে বিশ্বাস জাগাতে হবে।

–ওরা আমার অফিস পর্যন্ত তাড়া করে এসেছিল।

–দুজন একসঙ্গে?

–অন্তত দুজন। আমি ওদের গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

–আপনি তখন বললেন, অফিসে ঢুকে রিসেপসন অফিসের দরজাটা ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ঠিক তো?

–তারপর নিজের ঘরটায় ঢুকে ভেতর থেকে তালা লাগান।

দরজার কাছে এগিয়ে গেলো ম্যাকগ্রেভি–এই দরজাটা ওরা খুলেছে?

-হ্যাঁ।

–অথচ আপনি বলেছিলেন ভেতর থেকে তালা বন্ধ করার পর বাইরে থেকে খুলতে গেলে বিশেষ চাবির দরকার হয়।

জুড দ্বিধার সঙ্গে বললেন–হ্যাঁ। ম্যাকগ্রেভি ব্যাপারটা কোন্ দিকে ঘোরাতে চাইছে তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন।

–এর চাবি কার কাছে আছে?

–ক্যারলের কাছে একসেট থাকতো।

ম্যাকগ্রেভি হঠাৎ অতিমাত্রায় মার্জিত হয়ে বললেন–আর ঝাড়ুদাররা? তারা কিভাবে ঢোকে?

–ওদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ক্যারল সপ্তাহে তিনদিন একটু আগে আসতো। ওদের দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার করাতে।

–এটা তো খুবই অসুবিধাজনক ব্যবস্থা। কেন অন্য অফিসগুলো পরিষ্কার করার সময় ওরা আপনাদেরটা করে যেতো না?

–না। আমার এখানে এমন সব ফাইল থাকে যা অত্যন্ত জরুরী ও গোপনীয়। তাই আমি চাই না আমার অবর্তমানে কেউ এখানে ঢুকুক।

সার্জেন্ট সব লিখছে কিনা ম্যাকগ্রেভি দেখলো। আশ্বস্ত হয়ে সে আবার তাকালো জুডের দিকে।

–আমরা যখন আপনার রিসেপশন অফিসে ঢুকলাম, তখন বাইরের দরজার তালাটা খোলা ছিল। জোর করে নয়, চাবি ঘুরিয়ে খোলা।

জুড এই বক্তব্যের উত্তর দিলেন না।

ম্যাকগ্রেভি বলে চলল–আপনি এতক্ষণ আমাদের জানিয়েছেন ওই দরজার চাবিটা থাকতো আপনার আর ক্যারলের কাছে। ক্যারলের চাবি আপাতত আপনার হেপাজতে। একবার ভেবে বলুন তো ডঃ স্টিভেন্স, আর কার কাছে এই দরজার চাবি থাকা সম্ভব?

–আর কারুর কাছেই নয়।

–তাহলে ওরা কিভাবে ঢুকলো।

উত্তরটা জুডের মাথায় এসে গেল। মনে হয় ক্যারলকে খুন করার সময় ওরা চাবিগুলের ছাপ নিয়েছে।

ম্যাকগ্রেভির ঠোঁটের কোণায় অস্পষ্ট হাসির চিহ্ন–হুঁ, খুবই সম্ভব, তবে যদি নিয়ে থাকে তাহলে চাবিগুলোতে মোমের চিহ্ন থাকবে। আচ্ছা, আমি ল্যাবরেটারিতে টেস্ট করার ব্যবস্থা করছি।

জুড মাথা নাড়লেন! একটা মোক্ষম চাল দেওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর আত্মতৃপ্তির ব্যাপারটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

ম্যাকগ্রেভি বলল–তাহলে ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। দুজন লোক আপাতত ধরে নিলাম এর মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক নেই, দরজার চাবি নকল করে আপনার অফিসে ঢুকে আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। আমি কি ঠিক বলেছি?

–ঠিক।

এবার আপনি বলছেন, নিজের ঘরে ঢুকেও আপনি ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ঠিক আছে তো?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু আমরা এসে দেখলাম ওই ঘরের তালাটা খোলা।

–চাবিটাও তাহলে ওদের কাছে আছে।

–তাহলে এবার বলুন, সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেও ওরা আপনাকে হত্যা করলো না কেন?

–এর জবাব আমি আগেও দিয়েছিলাম। ওরা টেপের গলা শুনেছিলো তাই–

–তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, দুজন খুনে, যারা এত ঝামেলা করে আলো নেভালো, আপনাকে আটক করলো, তালা খুলে অফিসে ঢুকলোতারা শেষ পর্যন্ত আপনার একগাছা লোমও স্পর্শ না করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

ম্যাকগ্রেভির গলায় এবার ব্যঙ্গ।

জুড উত্তেজিত হয়ে বললেন–কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?

–বেশ, এখনও যখন আপনার মাথায় ঢোকেনি, তখন খোলসা করে বলছি। শুনুন ডাক্তার, আমার বিশ্বাস কেউ এখানে আসেওনি এবং আপনাকে হত্যা করার চেষ্টাও করেনি। সবটাই আপনার বানানো গল্প কথা।

–আমি আমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে বলিনি, বলুন লাইট নিভে যাবার কি ব্যাখ্যা দেবেন? আর বিগলা, সেই বা কোথায় গেল।

–সে এখন লবিতে।

–মারা গেছে?

–যখন আমাদের ঢুকতে দিল, তখন অবধি মরেনি। মেন সুইচের একটা তারের গণ্ডগোল ঠিক করতে পাতাল ঘরে ঢুকেছিল। আমরা যখন এলাম তখন ও সেই ঘর থেকে বেরোচ্ছে।

জুড হতবুদ্ধি হলেন ও আচ্ছা।

–আপনার উদ্দেশ্য আমি ঠিক ধরতে পারছি না স্টিভেন্স। তবে এখন থেকে আমি আপনার দলে নেই। তবে হ্যাঁ, একটা উপকার করতে হবে আপনাকে। এবার থেকে আমাকে আর ডেকে পাঠানোর দরকার নেই। দরকার হলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবো।

নোটবই মুড়ে নিয়ে সার্জেন্ট ম্যাকগ্রেভিকে অনুসরণ করলো।

হুইস্কির প্রভাবটা কেটে গেছে। আবার চারদিক অতলান্তিক কুয়াশা। জুড কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এই ধাঁধার কোনো চাবিকাঠি তার হাতে নেই।

কিন্তু কোন দিকে তিনি যাবেন? তিনিও কি মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগী হয়ে উঠেছেন? লক্ষণগুলো পরিষ্কার। গাড়ি দুর্ঘটনা? আজ রাতে দুজন লোকের হানা দেবার ঘটনা? খুনি না হয়ে ছিঁচকে চোরও তো ওরা হতে পারে, এর জ্বলন্ত প্রমাণ হাতেই আছে। ঘরে গলার আওয়াজ শুনে তারা পালিয়ে যায়। হস্ত করার উদ্দেশ্য থাকলে কেউ কি এইভাবে চলে যেতো?

তাহলে? জুড ভাবলে এসবই কি ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ? পুলিশের কাছে আবেদন জানানো অর্থহীন। একটা মতলব ধীরে ধীরে তার মাথায় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত টেলিফোন গাইডটা তুলে নিলেন।

.

নয়

পরের দিন বিকেল চারটে। জুড গাড়ি নিয়ে ওয়েস্ট সাইডের একটা ঠিকানাতে এলেন। বহু পুরোনো ফ্ল্যাট বাড়ি। জরাজীর্ণ অবস্থা, ইট খসানো চেহারা, দেখে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন ভুল জায়গাতে এসেছেন। পরক্ষণেই একটি ফ্ল্যাটের গায়ে নাম ফলক দেখতে পেলেন–

নরম্যান জেড মুডি, বে-সরকারি গোয়েন্দা, গ্যারান্টিসহ যে কোনো কাজের দায়িত্ব নেওয়া হয়।

–জুড গাড়ি থেকে নামলেন। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। একটু বাদেই তুষারপাত শুরু হবে। ফুটপাথে উঠে বাড়িটার প্রবেশ পথের সংকীর্ণ গলিটায় ঢুকে পড়লেন। জায়গাটা বাসি খাবার আর পেচ্ছাপের গন্ধে ভরা। ফলক লাগানো আরেকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাতে লেখা রয়েছে–নরম্যান জেড মুডি-র নাম।

নির্দেশ অনুসারে তিনি ভেতরে ঢুকলেন। মুডি বিলাসী জিনিসে টাকা খরচ করার লোক। নন, তা ঘরের চেহারা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে। এককোণে জরাজীর্ণ জাপানী পর্দা, তার

পেছনে চটা ওঠা টেবিল। খবরের কাগজ আর পুরোনো পত্রপত্রিকা চারপাশে ছড়ানো। চলাফেরা করাই দায়।

ভেতরের একটা দরজা সশব্দে খুলে মুডি বেরিয়ে এল। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতা, ওজন তিনশো পাউন্ড। হাঁটার ভঙ্গিমা গড়িয়ে চলার মতো। গোলগাল মুখ। টানা টানা হালকা সবুজ চোখ দুটো। ডিমের মতো মাথাটা টাকে ভরা। গোয়েন্দা না হয়ে তিনি যদি কমেডিয়ান হতেন তাহলে ভালো মানাতো।

–মিঃ স্টিভেনসন, মুডি অভ্যর্থনা জানালো।

–ডাঃ স্টিভেন্স, জুড বললেন।

–বসুন বসুন।

কোথায় বসা যেতে পারে জুড তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। একটা আরাম কেদারার ওপর বেশ কিছু পত্রিকা স্তূপাকার করে রাখা ছিল। সেগুলো নামিয়ে চামড়া ফাটা বিধ্বস্ত কেদারার ওপর সন্তর্পণে জুড বসলেন।

মুডি ততক্ষণে বিরাটাকৃতি একটা দোলনা কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়েছে এবার বলুন কোন কাজের জন্য আমাকে চাইছেন?

জুড় বুঝলেন মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। টেলিফোনে যোগাযোগের সময় নিজের নামটা তিনি বলেছিলেন। কয়েকদিন ধরে নিউইয়র্কের প্রায় প্রতিটি কাগজে তার নাম স্থান

পাচ্ছে। অথচ এই লোকটা তাঁর নাম শোনেনি। ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ভাগ্যক্রমে একজন বে-সরকারি গোয়েন্দার সন্ধান পাওয়াতে জুড খুশি হয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারছেন একে দিয়ে কোনো কাজই হবার নয়।

লোকটাকে না ঘাঁটিয়ে কিভাবে সরে পড়া যায় জুড তাই ভাবছিলেন।

–ভাবছিলাম মিঃ মুডি, এত তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসাটা আমার উচিত হয়নি। যে কারণে এসেছিলাম তার জন্য কিছুটা চিন্তার প্রয়োজন। আপনার সময় নষ্ট করলাম এজন্য দুঃখিত।

–ঠিক ঠিক; আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য আমার ফী দিতে হবে।

–কত?

–পঞ্চাশ ডলার।

জুড ঢোক গিললেন–ক্ষুণ্ণ মনে কিছু নোট গুনে গুঁজে দিলেন মুডির হাতে।

মুড়ি, বললেন অনেক ধন্যবাদ।

ইতিমধ্যে জুড দরজার দিকে এগিয়ে গেছে–ডাক্তার সাহেব?

অমায়িক ভাবে হাসছে মুডি–বলছিলাম, পঞ্চাশ ডলার যখন খসেই গেল তখন একটু বসে আমায় সমস্যাটা জানাতে পারতেন না? আমি সবাইকে বলি মন খুলে সমস্যার কথা বললে মন অনেক হালকা হয়। এটাও কি কম লাভ?

বিচ্ছিরি দেখতে এই লোকটার মুখে নীতিবাক্য শুনে জুডের হাসি পাচ্ছিলো। মানুষের বুক খালি করা সমস্যা শুনতে শুনতে তার জীবনের প্রহরগুলো কোথায় কেটে গেছে। ঘরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বে-সরকারি গোয়েন্দাকে নিরীক্ষণ করলেন তিনি। তারপর ভাবলেন, এতে আর কি ক্ষতি হবে? একটা অচেনা লোকের কাছে সব প্রকাশ করতে পারলে হয়তো কিছু উপকার হবে। ফিরে এসে আবার নিজের জায়গাতে বসলেন তিনি।

–ডাক্তার সাহেব, মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীর বোঝাটা বোধহয় আপনার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকের সম্বন্ধে এত চিন্তা ভাবনা করেন কেন? নিজের জন্য একটু সময় রাখবেন তো? আমি সবাইকে কি উপদেশ দিই জানেন তো? বলি, দ্যাখো বাপু, মেয়েছেলে আর টাকা–এই দুটি জিনিসকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলল, দেখবে তোমার প্রায় সব সমস্যাই মিটে গেছে।

বলুন ঠিক বলি কি না?

–আমার মনে হয় কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে।

–মনে হয়।

–হ্যাঁ। আপনি এমন কারোর নাম করবেন যিনি এইসব কেন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারেন?

–পারি বৈকি। একজনই আছেন তার নাম নরম্যান জেড মুডি। এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে আছেন।

এই কথা শুনে জুড দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

–আপনি আমায় কেন সমস্যাটা খুলে বলছেন না ডাক্তার সাহেব। দেখুন আমরা দুজনে মিলে তার সমাধান করতে পারি কিনা?

–জুড আর হাসি চাপতে পারলেন না। মুডির কথাগুলো তার অভ্যস্ত বুলির সঙ্গে মিলে গেছে। তিনিও রোগীদের বলে থাকেন আপনি আরাম করে কৌচে শুয়ে পড়ুন। মন খুলে সবকিছু বলে ফেলুন। দেখবেন আমরা দুজনে মিলে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলছি।

মনস্থির করলেন সবকিছু খুলে বলাই বাঞ্ছনীয়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গত কয়েকদিনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। কিছুক্ষণ পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন পরপর শব্দগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। এবার নিজের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথাটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। আর কিছু গোপন করলেন না।

তাঁর কথা শেষ হল। মুডি বলল আপনি একটা উটকো সমস্যায় পড়েছেন। মনে হয় কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে। অথবা মস্তিষ্কের ভারসাম্য আপনি হারিয়ে ফেলেছেন, তাই তো?

এই কথা শুনে জুড অবাক হলেন। একটু আগে যে লোকটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছিলেন, সে যে এমন কথা বলতে পারে জুড তা ভাবতেই পারেননি।

মুডি বলেই চলে–আপনি বললেন, দুজন পুলিশের গোয়েন্দা এর সঙ্গে জড়িত। তাদের নামে জানা আছে কি?

জুড দ্বিধায় পড়লেন। নাম দুটো কি বলা উচিত? শেষ পর্যন্ত নাম দুটি বললেন।

মুডির অভিব্যক্তি বদলে গেল–এমন কি কারণে আপনাকে হত্যা করা যেতে পারে, ডাক্তার?

–কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।

–আসুন মশাই, পথে আসুন। শত্রু দু-একজন থাকবে না তা কি হয়? আমি কি বলি জানেন? আমাদের জীবনটাকে যদি রুটির সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে শত্রুর ভূমিকা হবে নুনের মতো। নুন ছাড়া কি রুটির স্বাদ হয়? বিয়ে করেছেন?

–না।

–সমকামী নন তো?

–দেখুন, এইসব নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আমার আগেই কথাবার্তা হয়েছে।

–বটেই তো, আপনি এসেছেন আমার সাহায্যের জন্য। আচ্ছা, ধার-টার বাকি আছে নাকি বাজারে?

–ধার বলতে মাস কাবারী বিলগুলো পড়ে আছে।

–আর আপনার পেশেন্টরা?

–ওদের কি দরকার?

–দেখুন, এজন্য তো বলি, ঝিনুকের খোল যদি দরকার হয়, তো যেতে হবে সাগর তীরে। আপনার কাছে যারা আসে তারা বেশির ভাগই মাথা খারাপের রোগী, তাই তো?

–ভুল, জুড জবাব দিলেন–ওরা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

–সমস্যা তো বটেই, তবে মানসিক সমস্যা যার সমাধান নিজে করা যায় না। আচ্ছা, ওদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, আক্রোশ আছে যার? আপনার ওপর? আক্রোশ মানে, কাল্পনিক কিছু?

–সে থাকতে পারে, তবে ওদের অনেককেই আমি এক বছরের ওপর দেখেছি, ওদের অতীত জীবনের প্রায় সব কথাই জেনে ফেলেছি।

–ওরা কখনও আপনার ওপর রেগে ওঠে কি?

–এমন ঘটনা খুব একটা ঘটে না। মিঃ মুডি, কোনো রাগী লোকের সন্ধান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। একজন বিকৃত মস্তিষ্ক লোককে খুঁজছি আমি, যে দু-দুটো খুন করার পরও আমাকে হত্যা করতে চাইছে।

জুড আরো বললেন–আমার যদি সেরকম কোনো রোগী থেকে থাকে আর আমি যদি তাকে চিনতে না পেরে থাকি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সব থেকে খারাপ মনোবিজ্ঞানী বলবেন।

চোখ তুলে জুডি দেখলেন মুডি গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করছে।

মুডি হাসতে হাসতে বলল–গোড়ার কাজটা গোড়াতেই সেরে রাখা উচিত। আগে দেখতে হবে সত্যি সত্যি কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে নাকি আপনার মাথাটা বিগড়েছে। গাড়ি আছে আপনার?

–আছে। চলে যাবার ইচ্ছে জুডের তখন পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। এই নির্বোধ লোকটির মধ্যে একটা অদ্ভুত বুদ্ধিমান সত্ত্বা বাস করছে, জুড অবাক হলেন।

–আপনার নার্ভগুলো একটু জখম হয়ে পড়েছে, কয়েকদিনের জন্য আপনাকে ছুটিতে যেতে হবে।

–কবে?

–কাল সকালে।

–অসম্ভব। জুড প্রতিবাদ করেন। কাল অনেক পেশেন্টের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

–সব বাতিল করুন।

–তাতে আপনার কি লাভ?

–আপনার নিজের ব্যবসা কি করে চালাতে হবে সেও কি আমি বলে দেবো। এখান থেকে বেরিয়ে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকে পড়ন। নিজের জন্য সিট রিজার্ভ করুন। গ্রসিঞ্জারের কোনো হোটেলে। ক্যাটস্কিল পর্যন্ত আপনাকে বেশ লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। আপনার ফ্ল্যাটের কাছে গ্যারাজ আছে?

–আছে।

–তাহলে মিস্ত্রীকে বলুন লম্বা ট্যুরের জন্য গাড়িটাকে ঠিক করতে।

–এটা পরের সপ্তাহে করলে হতো না?

–রিজার্ভেশন হয়ে গেলেই আপনি অফিসে গিয়ে পেশেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বলবেন, বিশেষ জরুরী কাজে আপনাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। এক হপ্তার মধ্যে আবার ফিরে আসবেন।

–কখনই সম্ভব নয়।

–অ্যাঞ্জেলির সঙ্গেও যোগাযোগ করে নেওয়া ভালো। বাইরে যাবার সময় পুলিশ আপনাকে খুঁজে বেড়াক সেটা আমি চাইছি না।

–আমি এসব করতে যাব কেন?

–করবেন, আপনার দেওয়া পঞ্চাশ ডলার সদ্ব্যবহারের জন্য। হ্যাঁ, আমার পারিশ্রমিকের দুশো ডলার কিন্তু আগাম চাই। এর সঙ্গে খরচপাতি বাবদ আরো পঞ্চাশ ডলার।

চেয়ার থেকে মুডি তার বিরাট শরীরটা টেনে তুললাম খুব সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে। সাতটার সময় পারবেন তো?

–হ্যাঁ, বোধহয় পারবো।

–তাহলে বেরিয়ে পড়ুন।

চিন্তাচ্ছন্ন মনে জুড গাড়িতে উঠলেন।

মুডির পরিকল্পনা মতো সব কাজ শেষ হয়ে গেল। জুড ম্যাডিসন এভিনুর এক ভ্রমণ সংস্থার দপ্তরে ঢুকেছিলেন। তারা গ্রসিঞ্জারের হোটেলে ঘর ঠিক করে দিল। ক্যাটস্কিল সম্পর্কে। অনেকগুলি রঙীন বই দিল। জুড টেলিফোনে রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আগামী কিছুদিনের সাক্ষাৎকার বাতিল করলেন। সবশেষে উনিশ নম্বর থানায় অ্যাঞ্জেলিকে টেলিফোন করলেন।

অপারেটার জানালেন, উনি অসুস্থ আজকে আসেননি। ওনার বাড়ির নম্বর নেবেন কি?

–দিন।

অ্যাঞ্জেলির গলা শুনে জুড বুঝতে পারলেন সে সর্দিকাশিতে আক্রান্ত। তাকে বললেন–আমি কয়েকদিনের জন্য শহরের বাইরে যাব। খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

অ্যাঞ্জেলি বলল–খুব খারাপ চিন্তা করেননি। কোথায় যাচ্ছেন?

–গ্রসিঞ্জার পর্যন্ত যাব ঠিক করেছি।

–ঠিক আছে চিন্তার কিছু নেই। আমি ম্যাকগ্রেভির সঙ্গে কথা বলে নেবো। আপনার অফিসের ঘটনাটা শুনেছি।

–আপনি শুধু ম্যাকগ্রেভির বক্তব্য শুনেছেন।

–যে খুন করতে এসেছিল তাকে দেখেছেন?

–না।

–কিছু লক্ষ্য করেননি? রঙ, বয়েস কিংবা উচ্চতা।

–না। পুরো অন্ধকার ছিল।

–একটু সাবধানে থাকবেন।

–অবশ্যই।

হ্যারিসন বার্কের ওপরওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বার্কের সর্বশেষে শারীরিক অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন। কেস তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে তাও বললেন। পিটার হ্যাডলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে জুড মুডির কথা চিন্তা করছিলেন। লোকটার একটা মতলব তিনি ধরতে পেরেছেন। তাকে সমস্ত রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বাতিল করতে বলছে কেন? হয়তো কোনো একটা রোগীকে মুডি সন্দেহ করছে। তাই যদি হয় তাহলে যাত্রা পথে নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হবে। মুডি হয়তো লোকটাকে হাতে নাতে ধরতে চায়। ফ্ল্যাটবাড়ির টেলিফোন অপারেটার এবং দারোয়ানকেও সে গন্তব্যস্থলের ঠিকানাটা জানিয়েছে। এর অর্থ ভ্রমণ পথ সম্পর্কে কোনো গোপনীয়তা রাখতে মুডি ইচ্ছুক নয়।

ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই মাইকের সঙ্গে দেখা হল। জুড বললেন–মাইক, আমি কয়েকদিনের জন্য বেরোবো। আমার গাড়িটা ঠিক করে পেট্রল ভরে দাও।

–কিচ্ছু ভাববেন না, ডাঃ স্টিভেন্স। আমি সব ঠিক করে রাখবো। কখন দরকার?

–আমি ঠিক সকাল সাতটায় বেরোবো।

জুড বুঝতে পারলেন বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত মাইক তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভোর ছটায় অ্যালার্ম ঘণ্টা বেজে উঠলো। জুড বিছানা থেকে উঠলেন। দাড়ি কামালেন। পোশাক পাল্টালেন, পাঁচদিনের মতো জামা-কাপড় একটা সুটকেসে ভরলেন। টুকিটাকি জিনিস নিলেন। ফ্ল্যাটের দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন।

লিফটে নিচে নামলেন, গ্যারাজে এসে ওখানকার কীপার উইন্টের সন্ধানে চারপাশে তাকালেন। গাড়িটা দেওয়ালের একপাশে দাঁড় করানো আছে। পেছনের সীটে সুটকেসটা রাখলেন। চালকের আসনে বসলেন। সবেমাত্র গাড়ির চাবিটা ঢুকিয়েছেন হঠাৎ কে যেন তার পাশে এসে বসলো।

–আপনি একেবারে পাকা সময়ে এসে গেছেন। তার দিকে তাকিয়ে মুডি মিটিমিটি হাসছে।

জুড বললেন যাবার সময় আপনি দেখা করতে আসবেন আমি ভাবিনি।

নধর শিশুর মতো মুখটাতে চওড়া হাসি কি আর করি বলুন, কাজকর্ম হাতে নেই, ঘুমও হল না। যাই হোক, আপনার যাবার দরকার নেই। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

–বুঝলাম না কথাটা!

–বোঝেননি? সে কি মশাই? সোজা কথা।

গাড়ির দরজাটা খুলে মুডি হেলান দিয়ে দাঁড়ালো আপনার ছোট্ট সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কি সিদ্ধান্তে এসেছিলাম জানেন? আমি ভেবে দেখলাম, একটা তথ্য আমাদের

সব থেকে আগে জানা দরকার। সেটা হল, এই যে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর আপনার ওপর আক্রমণ আসছে, এটা কি আপনার মনোবিকৃতির কারণে না সত্যি কি আপনাকে কেউ লাশ বানাতে চাইছে?

–কিন্তু ক্যাটস্কিল?

–আরে না না ডাক্তার, ক্যাটস্কিল আদৌ আপনি যাচ্ছেন না। নিন, নামুন এখন। জুড গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

–ওটা হল প্রচার, এজন্যই তো বলি হাঙর যদি ধরতে হয় জলে আপনাকে নামতেই হবে।

মুডির কথায় জুড অবাক হয়ে গেছেন।

–ক্যাটস্কিল পর্যন্ত এ জীবনে যেতে পারতেন না ডাক্তার। গাড়ির সামনে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনাটা তুলে ধরলো মুডি। জুড পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইঞ্জিনের গায়ে টেপ দিয়ে জড়ানো তিনটে ডিনামাইট, সরু দুটি তার সেখান দিয়ে ঝুলছে।

–এগুলো আপনাকে লাশ বানাবার সরঞ্জাম।

জুড হতভম্ব হয়ে গেলেন আপনি কেমন করে...,

মুডি হাসলো কি বললাম আপনাকে? সারা রাত্রি ঘুমোতে পারিনি না? এখানে এসেছি মাঝরাত্রিতে। দারোয়ানটার হাতে কুড়ি ডলার খুঁজে ফুর্তি করতে পাঠিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্যস, কাজ শেষ।

–আপনি তাহলে দেখেছেন কে কাজটা করেছে?

–না। বিষাদে মাথা নড়ে মুডির–আমি আসার আগেই ওরা কাজ শেষ করে গেছে। ভোর ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কাউকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।

–সরু তার দুটোর দিকে ইঙ্গিত করলো মুডি আপনার বন্ধুরা মশাই অসম্ভব চালু। ইগনিশানের সঙ্গে ডিনামাইট লাগানো ছিল। রাস্তায় কোনো সময় ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলতে গেলেই আপনি মারা পড়তেন। পাছে একটা অচল হয়ে পড়ে সেই ভয়ে দুটো ব্যবস্থা। যা ছিল তাতে অর্ধেক গ্যারাজ উড়ে যেত।

জুডের মনে হল কেউ বোধ হয় তাকে আক্রমণ করেছে। মুডি উৎসাহের সঙ্গে বলতে থাকেন তাহলে দেখলেন তো আমরা কতখানি এগিয়ে গেলাম। দুটো হিসেব পরিষ্কার হয়ে গেল, এক নম্বর আপনি পাগল নন। দুনম্বর

এবার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। আমরা জানতে পারলাম, ভগবানের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো মানুষ আপনাকে খুন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় সম্ভবনাটি সাংঘাতিক।

.

দশ

বৈঠকখানায় বসে ওরা কথা বলছে। জুড বললেন–বোমার মাল-মসলাগুলো পুলিশকে দেখিয়ে নিলে ভালো হতো না?

–না মশাই, এইজন্য সকলকে বলি বেশি তথ্য জোগানোর অর্থই হল তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেওয়া।

–কিন্তু ম্যাকগ্রেভিকে বোঝানো...।

–আমি সত্যি কথা বলছি না।

–তাই কি?

জুড কথাটা ধরে ফেললেন। ম্যাকগ্রেভি হয়তো ধরে নেবেন তিনিই ওগুলো সাজিয়ে রেখেছেন। একজন বেসরকারি গোয়েন্দা পুলিশের সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করে দেবে। এটা তিনি মন থেকে কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। তবে লোকটাকে এখন আর পাগল বলে মনে হচ্ছে না, বরং ওই বেঁটে খাটো চেহারার লোকটির ওপর আস্থা ক্রমশ আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে।

মুডি বলতে থাকে–আপনি ডাক্তার আর আমি সাধারণ মানুষ। তাই তো বলি মধু কি যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। এর জন্য মৌচাকের কাছে যেতেই হবে।

এবার মুডির আপাত দুর্বোধ্য প্রবচনগুলির আসল অর্থ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে জুডের কাছে। তিনি বললেন তার মানে? সে বা তারা কি ধরনের লোক হতে পারে এই ব্যাপারে আমার অভিমত কি আপনি তা জানতে চাইছেন তো?

–ঠিক, আমি জানতে চাই যে উন্মাদাগার থেকে পালানো লোক, নাকি আরও গভীর কোনো ব্যাপার?

–আরো গভীর কিছু।

–একথা কেন ভাবছেন ডাক্তার?

–প্রথম কথা দুজন আমার অফিসে চড়াও হয়েছিল। একা হলে আমি উন্মাদ তত্ত্বটা মেনে নিতাম। কিন্তু দুজন পাগল একসঙ্গে আসবে, এটা বড় বাজে চিন্তা হয়ে যাচ্ছে না?

মুডি মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে বেশ বেশ, আপনার মাথাটা বেশ খোলতাই হয়েছে তো, বলে যান, বলে যান।

–দ্বিতীয়ত অসুস্থ মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে কোনো কাজ নিয়ম মেনে করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ম নীতি অনুসারে কাজ করা হয়েছে। জন হ্যানসেন বা ক্যারল রবার্টস কেন মরেছে আমি জানি না। কিন্তু আমি হলাম তৃতীয় বা শেষ লক্ষ্য।

–কেন?

অন্য কারোর ওপর যদি ওদের লক্ষ্য থাকতো তাহলে প্রথমবার আমাকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হবার পর ওরা আমাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতো না। ওদের তালিকায় পরবর্তী যে নামগুলো আছে তাদের ওপর চেষ্টা চালাতো। কিন্তু বার বার ওরা আমার ওপর হামলা চালাচ্ছে।

–বুঝলেন ডাক্তার, আপনার মধ্যে গোয়েন্দা হবার বেশ কিছু উপকরণ ছিল।

–বেশ কয়েকটা ব্যাপারটা আবার বোঝাও যাচ্ছে না।

–যেমন?

–প্রথমত আমাকে হত্যা করতে চাইছে কেন?

–ও ব্যাপারটায় আমরা পরে আসছি। আর কিছু?

–আরেকটা কথা। আমাকে খুন করবার ইচ্ছে থাকলে আমি যখন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম তখন ড্রাইভার আমাকে চাপা দিতে পারতো। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

–ঠিক এইখানে মিঃ বেনসন এস যাচ্ছেন।

জুড বিস্মিত হয়ে মুডির দিকে তাকালেন বেনসন?

–মিঃ বেনসন হলেন আপনার অ্যাক্সিডেন্টের সাক্ষী, আপনি আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি থানায় গিয়েছিলাম। পুলিশের রিপোর্টে ভদ্রলোকের নাম পেয়ে দেখা করে এলাম। ট্যাক্সি ভাড়া সাড়ে তিন ডলার, ঠিক আছে।

জুড মাথা নাড়লেন।

–মিঃ বেনসন পশমি পোশাকের কারবার করেন। বড়ো সুন্দর জিনিসগুলো, জানেন। যদি কখনও বান্ধবীদের জন্য ওইসব পোশাক কেনেন আমাকে বলবেন। মিঃ বেনসনকে বলে আমি ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার অ্যাক্সিডেন্টের দিন রাতে উনি একটা লিমুজিন আপনার দিকে ধেয়ে যেতে দেখেন। অবশ্য আপনিই যে সেই লোক উনি তা জানতেন না। উনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে মনে হয়েছিল গাড়িটা হঠাৎ পিছলে গিয়ে আপনাকে ধাক্কা মেরেছে। উনি দৌড়ে আপনার কাছে আসছিলেন। হঠাৎ উনি লক্ষ্য করলেন গাড়িটা আবার পিছিয়ে এসে আপনার দিকে তাড়া করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে ড্রাইভার আপনাকে ফেলে চম্পট দেয়।

–তার মানে, মিঃ বেনসন যদি না দেখতেন?

–হ্যাঁ। তাহলে আর আমাদের দেখা হতো না। ব্যাপারটা পরিষ্কার। এটা একটা খেলা নয়। আপনাকে খতম করাই ওদের উদ্দেশ্য।

–কিন্তু অফিসে চড়াও হওয়া—

মুডি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর বলল–হ্যাঁ, এটা একটা জটিল ব্যাপার। আমি মেনে নিচ্ছি ওরা আপনাকে খুন করতে এসেছিল। বুঝতে পারল, ঘরে আরও একজন আছে। অমনি পালিয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না।

ঠোঁট কামড়ে সে আবার ভাবতে শুরু করে। তারপর বলে, যদি না

যদি না কী?

–আমি ভাবছি...

–কী?

–ওটা আপাতত থাক। ছোটো একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যার উদ্দেশ্য বের করতে পারব না, ততক্ষণ সেই মতলবটা কোনো কাজে লাগবে না।

–আমি তো এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যা থেকে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মুডি কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিল ডাক্তার আপনার এমন কোনো গোপন ব্যাপার আছে কি, যা জন হ্যানসেন আর ক্যারল রবার্টসের জানা ছিল? তার মানে আমি জানতে চাইছি,

এমন কোনো গোপন ব্যাপার যেটা শুধু আপনারা তিনজন জানতেন।

জুড মাথা নাড়লেন–না, পেশেন্টদের সম্পর্কে আমার পেশাগত গোপনীয়তা বাদে আর কোনো ব্যাপার নেই। ওদের কেসহিস্ট্রির মধ্যেও কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নেই যা

ওদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন ডিটেকটিভ, আমার পেশেন্টরা কিন্তু কেউই সিক্রেট এজেন্ট বা জেল পালানো আসামী নয়। নেহাত সাধারণ বাড়ির গিন্নি অথবা ব্যবসা করে, কেউ কেরাণী এই আর কী।

–আপনি তাহলে নিশ্চিত যে কোনো উন্মাদ এই খুনের দলের সঙ্গে যুক্ত নয়।

–একেবারেই নিশ্চিত। এ সম্পর্কে গতকালও আমার মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, এক-এক সময় আমি নিজেকেই বদ্ধ উন্মাদ বলে ভাবছিলাম। গাড়িতে বোমা রাখার ঘটনাটা আবিষ্কার হবার পর এ ব্যাপারে আমার প্রত্যয় আকাশ ছুঁয়েছে।

মুডি মুচকি হাসল–যাক তাহলে ওই চিন্তাটা আপনার মন থেকে দূর করতে পেরেছি বলুন।

জুড অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন–আচ্ছা, আমরা যা যা জেনেছি, তা পুলিশের কাছে গিয়ে বললে কী হয়?

মুডি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল–আপনার কি ধারণা এগোনোর মতো কোনো কিছু আমরা হাতে পেয়েছি?

জুড নীরব রইলেন।

–নিরাশ আপনাকে করছি না। আমরা সঠিক পথে প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছি মাত্র। আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

দুজনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ঘরের ছাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মুডি বলে ওঠে–হ্যাঁ, ফ্যামিলি।

–ফ্যামিলি?

–ডাক্তার, আপনি যখন বললেন, প্রত্যেকটা পেশেন্টের সব খবর আপনার জানা আছে, আমি বিশ্বাস করছি। যদি আপনি বলেন, ওদের কারও পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়, তাও আমি মেনে নেব। মৌচাক যখন আপনার, মধুর মালিক তো আপনিই হবেন।

–না, অনেক সময় ওরা খবরটা জানাতে পারে না।

–এই তো হয়েছে।

–আপনি বলতে চাইছেন ওদের কোনো আত্মীয় আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে?

–হতেও পারে।

–এই সম্ভাবনাটা খুবই কম।

–কথাটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন ডাক্তার সাহেব? গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে। আপনি যে সমস্ত পেশেন্টদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাদের নামের একটা তালিকা আমাকে দিতে পারবেন কি?

জুড কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বললেন–না।

–ডাক্তার রোগীর গোপন সম্পর্কের ব্যাপার তো। কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষেত্রে নিয়মের হেরফের হলেই ভালো হয়। মনে রাখবেন, আপনার জীবন বিপন্ন। আপনার একটা ভুল পদক্ষেপে সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে।

–আপনি ভুল পথে এগোচ্ছেন মিঃ মুডি। আমার পেশেন্ট বা তাদের পরিবারের কোনো লোকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। ওদের পরিবারের কারও মধ্যে পাগলামির লক্ষণ থাকলে সেটা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ত। পেশেন্টদের স্বার্থ আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

–আপনি বলছেন ওদের ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই?

–অন্তত এমন কিছু নেই, যা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

জুড চোখ বন্ধ করে ফাইলের বিষয়গুলি ভাববার চেষ্টা করলেন। জন ম্যানসান থার্ড এভিনিউর শুড়িখানা থেকে নাবিকদের ধরে আনত। টেরি ওয়াশ বার্ন ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে যৌন সংযোগ করায়। চোদ্দো বছরের ইভলিন ওয়ারশ্যাক বাড়িতে থেকে বেশ্যা বৃত্তি করে।

অথচ বাইরের সমাজে এদের একটা সুন্দর পরিচয় আছে।

তিনি মুখ খুললেন–আমি দুঃখিত, ফাইল দেখাননা সম্ভব নয়।

দুকাঁধে কঁকুনি তোলে মুডি–কিছু অনাবশ্যক কাজ তা হলে আপনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছেন?

–আপনি এখন আমাকে কী করতে উপদেশ দিচ্ছেন?

–গত একমাসে আপনার পেশেন্টদের কথাবার্তার যেসব টেপ করেছেন, সেগুলো মন দিয়ে শুনুন। তবে এখন আর ডাক্তার হয়ে শুনবেন না, শুনবেন একজন গোয়েন্দা হিসেবে। কারোর বক্তব্যের মধ্যে এধার ওধার হয়ে গেলেই সেটা খেয়াল করে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

–সেটা তো আমি শুনি, ওটাই আমার কাজ।

–আবার শুনুন। তবে চোখ ভোলা রাখবেন। রহস্য উদঘাটনের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

ওভারকোট তুলে নিয়ে মুডি পড়তে শুরু করল। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝি ভালো নাচিয়ে। সে বলল–এত সবের মধ্যে সব থেকে মজার ঘটনা কী বলুন তো?

–কী?

–আপনি আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন দুজন আপনাকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সংখ্যাতে আরও বেশি।

জুড হতভম্বআপনি বলতে চাইছেন একটা পাগল গোষ্ঠী আমার পেছনে লেগেছে?

–ডাক্তার, এই খেলার রেফারী সম্বন্ধে আমি, কিছু আন্দাজ করেছি। তার উদ্দেশ্য আমি জানি না। তবে পরিচয়টা পেয়েছি।

–কে সে?

–না ডাক্তার এখন নয়। বুলির মশলা মেখে মজুত না করে আমি বুলি ছোটাতে রাজী নই। আগে নিজে নিশ্চিত হই, তারপর আপনাকে জানাব।

–আশা করি আপনি সুনিশ্চিত হতে পারবেন।

–নিজের জীবনের যদি কানাকড়ি মূল্য দিয়ে থাকেন, তা হলে প্রার্থনা করুন আমার যেন ভুল হয়।

ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

ট্যাক্সি ধরে জুড অফিসে পৌঁছলেন। দরজার ভেতর থেকে চাবি আঁটলেন। চলে এলেন কাঠের তক্তাটার কাছে। এখানে টেপগুলো লুকোনো আছে। গোপন জায়গায় বোতাম টিপে তক্তাটাকে সরিয়ে দিলেন। পদবী অনুযায়ী টেপগুলো সাজানো। সর্বশেষ নেওয়া টেপটা রেকর্ডারে চালিয়ে দিলেন। এর আগে রোগীদের সমস্ত সাক্ষাতকার তিনি বাতিল করেছেন। তাকে অনেকটা সময় একলা থাকতে হবে। রোগীদের পরিবারের লোকেরা

এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে, এটা সুদূর প্রসারী কল্পনা। তবু লোকটা যখন বলছে, একবার ভেবেই দেখা যাক।

রোজ গ্রাহামের সাক্ষাতকারের টেপটা তিনি শুনছিলেন।

–এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ডাক্তারবাবু, ন্যান্সি এমনিতেই কাঁদুনে বাচ্চা। তাকে যদি আমি আঘাত করি, তাহলে কী হবে বলুন তো।

–ও এত কাঁদে কেন তা জানতে চেষ্টা করেছেন কি?

–ওর বারোটা বেজে গেছে। ওর বাবা এর জন্য দায়ী। মেয়ে অন্ত যার প্রাণ ছিল সেই হ্যারি ওকে রেখে পালিয়ে গেল কী করে?

–আপনাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। তাই তো?

–না, বিয়ে আমাদের প্রায় হতে চলেছিল।

–কতদিন আপনারা এক সঙ্গে থেকেছেন?

–চার বছর।

–ন্যান্সির হাত ভেঙে দেবার যে ঘটনাটা বললেন সেটা কবে ঘটেছে?

–এক সপ্তাহ হবে বোধহয়। আসলে ওর হাত ভাঙাটা আমার ঠিক. ইচ্ছাকৃত নয়। মেয়েটা কিছুতেই কান্না থামাচ্ছে না দেখে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। পর্দার হুড খুলে পিটিয়ে ছিলাম।

–আপনার কি মনে হয়, হ্যারি আপনার থেকেও ন্যান্সিকে বেশি ভালোবাসত?

-না-না, হারি আমার জন্যও পাগল ছিল।

–তাহলে সে আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?

–কারণ সে পুরুষ, পুরুষ মানুষেরা কী জানেন তো? জন্তু। আপনারা প্রত্যেকে একটা জন্তু। আমার মনে হয় আপনাদের শুয়োরের মতো মেশিনে ফেলে কাটা উচিত।

এবার কান্না।

জুড টেপ বন্ধ করলেন। রোজ গ্রাহামের কথা ভাবতে থাকলেন। মেয়েটা পুরুষ বিদ্বেষী, এটাও এক ধরনের মনোবিকার। মারতে মারতে দু-দুবার সে নিজের ছবছরের মেয়ে ন্যান্সিকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কিন্তু হ্যানসেন বা ক্যারলের মৃত্যুর সাথে ওর মানসিকতা খাপ খায় কী?

পরের টেপটা চালালেন তিনি। আলেকজাণ্ডার ফ্যালন।

–মি. ফ্যালন, পুলিশ বলছে আপনি নাকি মি. চ্যাম্পিয়ানকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন?

–আমাকে যা বলা হয়েছে তাই করেছি।

–কেউ তাহলে আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছিল?

–সে যখন বলেছে।

–সে বলতে?

–ভগবান।

–হঠাৎ ভগবান বলতে গেলেন কেন?

–কারণ চ্যাম্পিয়ান লোকটা ভীষণ বদমাইস। সে একজন অভিনেতা। আমি দেখেছি, স্টেজে সবার সামনে সে একটা মেয়েকে চুমু খেয়েছে। চুমু খেয়েছে আর...

–বলে যান।

–তার বুকে হাত দিয়েছে।

–এতে কি আপনি রেগে গিয়েছিলেন?

–নিশ্চয়ই, রাগব না? এর মানে কী বলুন তো? এর মানে লোকটার মনে কামভাব জেগেছিল।

–এই জন্য ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন?

–সিদ্ধান্ত আমি নিইনি, বারবার আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? ভগবান নিয়েছেন। আমি কেবল তার আদেশ পালন করেছি।

–ভগবানের সঙ্গে আপনার প্রায়ই কথাবার্তা হয়?

–কাজ থাকলেই হয়। তিনি আমাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ আমার মন একেবারেই সাচ্চা। আর এটা হয়েছে কী করে জানেন? বলুন তো এই পৃথিবীতে কোন্ কাজটা সব থেকে পুণ্যের? বদ লোককে দেখো আর কেটে ফেলল।

আলেকজাণ্ডার ফ্যালন। বয়স পঁয়ত্রিশ। পাউরুটি কারখানার মালিকের সহকারী। কমাস মনোরোগের হাসপাতালে ছিল। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু হ্যানসেনের মতো এক সমকামীকে সে হত্যা করবে কেন? ক্যারলের মতো প্রাক্তন বেশ্যা? না, এ দুজনকে হত্যা করার দায়িত্ব ভগবান কি তাকে দিতে পারেন?

ডাক্তার ভেবে দেখলেন, এ সম্ভাবনা খুবই কম।

আরও কয়েকটা টেপ চালিয়ে ঈপ্সিত বস্তু খুঁজে পেলেন না তিনি। নিরাশ হয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন অপারেটরের ফোন

এগার

টেলিফোন অপারেটরের ফোন। মেয়েটি জানাল, একমাত্র অ্যানি ব্লেক ছাড়া আর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। জুড ধন্যবাদ জানিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

তার মানে অ্যানি আসছে। মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রথম দিনের কথাবার্তার টেপটা বের করলেন তিনি।

–আরাম করে বসেছেন মিসেস ব্লেক?

–হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

–কোনো অসুবিধা নেই?

–না-না।

–আপনি হাত মুঠো করে আছেন কেন?

–ও কিছু নয়। আমার স্নায়ু সামান্য চড়ে আছে তো তাই।

–কী বললেন?

দীর্ঘ নীরবতা।

–পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বলুন। ছমাস আপনার বিয়ে হয়েছে।

–হ্যাঁ।

–বেশ বলে যান।

–যাকে বিয়ে করেছি সে খুব ভালো। বাড়িটাও সুন্দর।

–বাড়িটার বর্ণনা দিন।

–কান্ট্রি ফ্রেঞ্চ বাড়িটার নাম। ভালো জায়গা। আমাদের ছাদে ব্রোঞ্জের একটা অদ্ভুত ধরনের মোরগ আছে, তার লেজ নেই। প্রায় পাঁচ একর জমি আমাদের বলতে গেলে গাছ পালায় ভর্তি। ওর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগে। মনে হয় আমি যেন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য ফিরে গেছি।

–গ্রাম আপনার ভালো লাগে?

–ভীষণ।

–আর আপনার স্বামীর?

–মনে হয় ওর ভালো লাগে।

–ভালো না লাগলে শহরের বাইরে কেউ পাঁচ একর ফাঁকা জায়গা কেনে বলুন?

–ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। হয়তো আমার জন্য কিনেছে। ভীষণ দয়ালু মন ওর।

–বলুন, ওঁর কথা কিছু শোনা যাক। নীরবতা।

–দেখতে কেমন ওঁকে? ভালো?

–অ্যান্টনির অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা।

–শারীরিক দিক থেকে ওঁর সঙ্গে মোকাবিলায় আপনি অক্ষম?

–হ্যাঁ।

জুড প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।–আপনি সন্তান চান না?

–নিশ্চয়ই।

–আপনার স্বামী?

–সেও নিশ্চয় চায়।

আবার দীর্ঘ নীরবতা।

–মিসেস ব্লেক, কোন্ সমস্যায় পড়ে আপনি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? সমস্যাটা কি আপনার স্বামীকে নিয়ে?

জবাব নেই।

–বেশ তাহলে সেটাই ধরে নিলাম। আপনি এতক্ষণ যা যা বললেন তা শুনে বুঝতে পারছি, আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন। একে অন্যকে বিশ্বাস করেন। দুজনেই সন্তান চান। যে বাড়িটায় থাকেন, সেটাও খুব সুন্দর। আর্থিক অসঙ্গতি নেই। মাত্র ছমাস আপনারা বিয়ে করেছেন। মিসেস ব্লেক আপনার কথা শুনে একটা প্রাচীন রসিকতা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার সমস্যাটা তা হলে কী ডাক্তারবাবু? এটাই বোধ হয় আপনার আসল সমস্যা। তাই নয় কি?

কিছুক্ষণ টেপে যান্ত্রিক শব্দ তারপর অ্যানির গলা।

–এ সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত। ভেবেছিলাম, অচেনা কারোর কাছে সবকিছু খুলে বলতে পারব। কিন্তু এখন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

জুডের মনে পড়ল, ঠিক এই সময় অ্যানি দেহটা বেঁকিয়ে তার আয়ত চোখ দুটি মেলে ধরেছিল। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল। বলেছিল–বুঝতেই পারছেন, তারপর দ্বিধার প্রাচীরটা হুড়মুড় করে ভেঙে দিল সে–হঠাৎ কিছু কথা আমার কানে এসে যায়।

–ব্যাপারটা কি আপনার স্বামীর কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে, মানে মেয়েছেলে সংক্রান্ত?

–না।

-ব্যবসা সংক্রান্ত।

–হ্যাঁ।

–আপনি কি মনে করেন উনি কিছু চেপে গেছেন?

–অনেকটা তাই।

–ও তাহলে বিশ্বাসে আঘাত করেছে। সম্ভবত ওর এই ধরনের আচরণ আপনি দেখেন নি।

–আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমার মনে হয় এখানে আসাটা উচিত হয়নি। আমি বোধহয় বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করলাম। দয়া করে এ নিয়ে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না ডাক্তার স্টিভেন্স।

সাক্ষাতকার শেষ। জুড টেপ বন্ধ করে দিলেন।

তাহলে অ্যানির স্বামী রহস্যজনক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে? দেউলিয়া করেছে কাউকে অ্যানি এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে? হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনিতে অ্যানি স্পর্শকাতর, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

জুড কোনোদিন লোকটাকে দেখেননি। যত রহস্যময় কারবারই সে করুক না কেন, জন হ্যানসেন অথবা ক্যারল রবার্টসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

আর অ্যানি? অ্যানির পক্ষে এই কাজ করা কি সম্ভব? চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তিনি আবার ভাবতে শুরু করলেন।

অ্যানি যতটা বলেছে, সেটাই কি তার সব কথা? অ্যানির নানা ভঙ্গিমা স্মরণ করলেন ডাক্তার জুড। কিন্তু কোনো বদ অভিপ্রায় খুঁজে পেলেন না।

উদ্দেশ্যহীনভাবে টেপ বাজতে গিয়ে টেরি ওয়াশ বার্নেরটা বেছে নিলেন।

–আপনার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আপনি মোট পাঁচবার বিয়ে করেছেন?

–ছবার।

–আপনার প্রাক্তন স্বামীরা প্রত্যেকেই কি আপনাকে খুশি করতে পেরেছে?

খিলখিল করে হাসি।

–আমাকে হাসালেন। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যে আমাকে খুশি করতে পারে। আমার খুশি হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আমার দৈহিক পরিতৃপ্তির ওপর নির্ভর করছে।

–দৈহিক পরিতৃপ্তি বলতে?

–মানে বুঝলেন না। আমার শরীরে এমন একটা জায়গা আছে, সেটা সবসময় উত্তপ্ত থাকা দরকার।

–আপনার কি ধারণা দৈহিক দিক থেকে আপনি অন্য মেয়েদের থেকে একদম আলাদা?

–নিশ্চয়ই, স্টুডিও ডাক্তার বলেছেন, আমার ওখানে কীসব গ্রন্থি ট্রন্থি নাকি অন্য ধরনের। একটু থেমে, লোকটার সঙ্গে শুয়ে আরাম আছে।

–আমি আপনার দৈহিক চার্ট দেখেছি। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে আপনার শরীর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

–পাছায় লাথি মারি ওই চার্টের। আপনি নিজে একবার যাচাই করে নিচ্ছেন না কেন?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। তবু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন মিসেস ওয়াশবার্ন?

–আপনাকে ভালোবাসা যেত, সামান্য নীরবতা, কী করব বলুন। বলেইছি তো আমার দেহটাকে ভগবান একেবারে অন্যভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমার যৌন খিদে কোনো সময় মেটে না।

–আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি না। কিন্তু মিসেস ওয়াশবার্ন আমার যা ধারণা দেহ আপনার ক্ষুধার্ত নয়। আপনি একটা অদ্ভুত আবেগের তাড়নায় ভুগছেন।

–আবেগের তাড়নায় আমি কোনো দিন কারো সঙ্গে যৌন সংযোগ করিনি। আপনি আমাকে কীসব উল্টোপাল্টা বলে চলেছেন। আমি কি দশ বছরের খুকি নাকি?

–আপনাকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে আমার কী লাভ?

–তাহলে উদ্দেশ্যটা কী আপনার?

–আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে সাহায্য করা।

–তাহলে বসুন দেখি আমার পাশে।

–আজকে এই পর্যন্ত থাক। সুইচ বন্ধ করতে গিয়ে জুডের একটা কথা মনে পড়ে গেল। নোরা হ্যাডলি চলচ্চিত্র জগতের পোকা। চলচ্চিত্র বিষয়ক এমন কোনো পত্রিকা নেই, যা সে পড়ে না। সব সময় এই নিয়েই কাটায়। ফোন তুলে ডায়াল ঘোরালেন তিনি।

নোরা ফোন ধরলেন।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর জুড আসল প্রসঙ্গ তুললেন।

–নোরা, তুমি টেরি ওয়াশ বার্নের নাম শুনেছ?

–টেরি ওয়াশ বার্ন, মানে যে সিনেমা করত? হঠাৎ তার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

–না এমনি। আজ সকালে ওকে ম্যাডিসন এভিনিউতে দেখলাম।

–সামনা সামনি! সত্যি নোরা যেন শিশুর মতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন, বলুন না কেমন দেখাচ্ছিল ওকে? বয়সের ছাপ পড়েছে, নাকি আগের মতোই মিষ্টি চেহারা? রোগা না মোটা?

–খুব ভালো দেখাচ্ছিল। এককালে ও খুব বড়ো অভিনেত্রী ছিল তাই তো।

–বড়ো মানে? কী বলছেন কী? টেরি ওয়াশবার্ন আমার মতে সর্বকালের সেরা অভিনেত্রী।

–যাই হোক, ওকেও হলিউড ছাড়তে হয়েছে তো।

–ও তো নিজের থেকে ছাড়েনি, ওকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপনাদের মতো ডাক্তারদের নিয়ে এই হয়েছে এক মুশকিল। আপনারা বাইরের জগতের কোনো খবর রাখতে চান না কেন? জানেন না টেরি কত বড়ড়া একটা কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে?

–আহা, কী হয়েছিল বলো তো?

–টেরি ওর বয়ফ্রেন্ডকে খুন করেছিল।

.

বার

আবার তুষার পড়তে শুরু হয়েছে। পনেরো তলার ওপরে থেকেও রাস্তায় যানবাহন চলাচলের শব্দ পাচ্ছিলেন জুড।

–নোরা, তুমি ঠিককার সঙ্গে কথা

–জানেন আপনি, কার সঙ্গে কথা বলছেন? আমি হচ্ছি হলিউডের একটা জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া। শুনুন তাহলে ঘটনা। টেরি তখন কন্টিনেন্টাল স্টুডিওতে কাজ করছে। একজন সহকারী পরিচালক ওকে দেখাশোনা করত। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করল, লোকটা ওকে প্রতারণা করেছে। ক্ষেপে গিয়ে ও ছুরি চালিয়ে দিল। লোকটা মরে গেল। কন্টিনেন্টালের মালিক অনেক কলকাঠি নেড়ে অনেক লোককে টাকা খাইয়ে ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এলেন যেন ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা শর্তে তাকে রাজি হতে হয়েছিল। সেটি হল, টেরিকে চিরদিনের জন্য হলিউড ছেড়ে চলে যেতে হবে। টেরি কিন্তু ওই কথার অমান্য করেনি।

জুড বোবার মতো ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–হ্যালো, হ্যালো আপনি আমার কথা শুনছেন তো?

–হ্যাঁ, বলে যাও, আমি শুনছি তোমার কথা।

–আপনার কথাগুলো বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

–এসব তুমি কোথাথেকে শুনেছ?

–শুনেছি কী? আপনি আবার আমাকে অবাক করলেন। সমস্ত খবরের কাগজের ম্যাগাজিনে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। সকলে এই ঘটনাটা জানে।

–ধন্যবাদ নোরা, পিটারকে বলল আমি ফোন করেছিলাম।

রিসিভার রেখে চিন্তান্বিত অবস্থায় ডাইরিটা টেনে নিয়ে জুড লিখলেন–টেরি ওয়াশবার্ন।

ফোন বেজে উঠল।

–ডাঃ স্টিভেন্স?

অ্যাঞ্জেলির গলা–আপনি কেমন আছেন জানতে ফোন করেছি। নতুন কিছু ঘটেছে। নাকি?

জুডের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। বোমার ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পেলন না।

–ওরা আবার চেষ্টা করেছিল, মুডি এবং গাড়িতে বোমা রাখার ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

অ্যাঞ্জেলির গলায় উত্তেজনা–বোমাগুলো কোথায়?

–ওগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

অ্যাঞ্জেলি হতভম্ব কী করা হয়েছে? কে করল এ কাজ?

–মুডি। উনি আমাকে বলেছেন, এতে নাকি কিছু এসে যাবে না।

–কিছু এসে যাবে না? পুলিশ ডিপার্টমেন্টটা ঘাস কাটার জন্য রাখা হয়েছে নাকি? ওগুলো দেখেই আমরা বলে দিতাম কার কাজ?

–সেটা কীরকম?

–প্রত্যেক লোকের কিছু না কিছু অভ্যেস থাকে। অভ্যেসবশত কেউ একবার কোনো কাজ করলে দ্বিতীয়বার সেই কাজ করার সময় একই পদ্ধতিতে অনুসরণ করে থাকে। যাই হোক, লোকটার সন্ধান আপনাকে কে দিল?

–টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে নাম পেয়েছিলাম।

নিজের কানেই কেমন যেন ঠেকল জুডের।

অ্যাঞ্জেলি ঢোক গিলল। শব্দটা তিনি শুনতে পেলেন। ওঃ, তার মানে ওর সম্পর্কে আপনার কিছু জানা নেই।

–কিন্তু ওর ওপর আমার বিশ্বাস জন্মেছে।

–জানেন তো এইরকম ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

–কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কী করে জড়িত থাকবেন? আমি তো নিজেই তাকে ডেকেছি।

–আমি যদি বলি, আপনার মনে আস্থা জাগানোর জন্য নিজেই বোমাটা গাড়িতে লাগিয়ে রেখেছিল।

–সেদিক থেকে ব্যাপারটা আপনি চিন্তা করতে পারেন। আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?

–কিছুদিনের জন্য শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বলছি।

–পেশেন্টদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় স্যার।

–ডাঃ স্টিভেন্স।

–এতে সমস্যা সমাধান হবে না। আমি নিজেই জানতে পারলাম না কীসের ভয়ে পালাচ্ছি। ফিরে আসার পর আবার একই ঘটনা ঘটবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়?

কিছুক্ষণ নীরবতা। অ্যাঞ্জেলি কথা বলতে শুরু করল। তার গলা ধরে গেছে ঠিকই বলেছেন। মুডির সঙ্গে এরপর কবে আপনার দেখা হচ্ছে?

–বলতে পারি না, উনি বলছিলেন, কে এ সব করছে, সে সম্বন্ধে ওনার ধারণা জন্মেছে।

–একথা একবারও ভেবে দেখেছেন কিনা, যেসব লোক আপনার পেছনে লেগেছে, তারা মুডির পেছনে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে পারে। শুনুন ডাঃ স্টিভেন্স, যদি সে

আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে, তাহলে আমাকে খবর দেবেন। দুদিন আমি বাড়িতেই আছি। অফিস যাচ্ছি না। আর যাই করুন, একা তার সঙ্গে কখনও দেখা করবেন না।

–আপনি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে অনর্থক চিন্তা করছেন। যেহেতু তিনি আমার গাড়ি থেকে বোমা আবিষ্কার করেছেন–

–না-না, শুধু সেই কারণে নয় ডাঃ স্টিভেন্স। আমার ধারণা আপনি একটা ভুল লোককে বাছাই করেছেন।

–বেশ ওর সঙ্গে কথা হলেই আপনাকে জানাব।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জুড।

অ্যাঞ্জেলি কি অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছে? তবে মুডি এই কাজটা করেও থাকতে পারেন। এর পরের কাজটা আরও সোজা। নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে, এই অজুহাত দেখিয়ে তাকে নির্জন কোনো জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর? জুড কেঁপে উঠলেন। তিনি লোকটার চরিত্র সম্পর্কে আগাগোড়া ভুল ধারণা করে এসেছেন? বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজে তাঁর চিন্তা ছিন্ন হল। ঘড়ির দিকে তাকালেন। অ্যানি নাকি?

হ্যাঁ, অ্যানি। নিখুঁত ছাঁদের একটা নীল পোশাক পরেছে। মাথার ছোট্ট টুপিতে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। ও এত আত্মনিমগ্ন ছিল যে, ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও খেয়াল করল না।

–হ্যালো, জুড অবশেষে বললেন।

অ্যানি চমকে তাকাল। বলল–হ্যালো।

–আসুন।

ভেতরে ঢোকার সময় ক্ষণিকের জন্য জুড অ্যানির পেলব শরীরের স্পর্শ অনুভব করলেন।

ঘুরে দাঁড়াল অ্যানি। অবিশ্বাস্য রকম বেগুনি চোখ দুটি মেলে ধরল যে লোকটা আপনাকে গাড়ি চাপা দিয়ে পালাল, তার সন্ধান পাওয়া গেছে?

জুড তার মুখে চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করলেন। এই কৌতূহলী ভাবটা খুবই স্বাভাবিক ঠেকল তার কাছে।

বললেন–না, এখনও পাইনি।

–আপনাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু না করলেই পারতেন।

–না-না, আমি ঠিক আছি। আজ সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিয়েছি। শুধু আপনাকে যোগাযোগ করতে পারিনি।

অস্বস্তি ফুটে উঠল–ও ক্ষমা করবেন। তাহলে বরং আজ আমি যাই।

–আরে না-না, জুড কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। ওরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় বরং আমি খুশিই হয়েছি। বলুন কেমন আছেন?

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত অ্যানি নিজেকে সামলে নেয়। একটু চিন্তায় পড়েছি।

–ইওরোপ ভ্রমণের দিন কবে স্থির হল?

–বড়োদিনের দিন সকালে।

–কোথায় কোথায় যাচ্ছেন?

–স্টকহোম, প্যারিস, লন্ডন, রোম–আপাতত এই।

–কতদিন ঘোরার পরিকল্পনা। মলিন একচিলতে হাসি ঠোঁটের কোণে ওসব জানি না। অ্যান্টনির এসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা থাকে না।

–ও আচ্ছা, জুড প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইলেন, মিসেস ব্লেক, আপনাকে কিন্তু আমি মিথ্যে অজুহাত পেয়ে ডেকে এনেছি। আমার ইচ্ছে হল আপনার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেব।

–জানি, আমিও আপনার কাছ থেকে বিদায় চাইতে এসেছি। অ্যানির গলায় অদ্ভুত পরিবর্তন। জুড, বলেই তার দিকে সরাসরি চোখ মেলে দিল অ্যানি।

এক অদম্য আকর্ষণে অ্যানির দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও জুড নিজেকে থামিয়ে রাখলেন। মিষ্টি হেসে বললেন, রোমে পৌঁছে আমার নামে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিও কিন্তু?

অ্যানি বেশ কিছুক্ষণ জুডের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল–নিজের দিকে খেয়াল রেখো জুড।

জুড মাথা নাড়লেন। কথা বাড়াতে সাহস পেলেন না।

অ্যানি বেরিয়ে গেল।

টিং টিং শব্দে তিনবার ফোন বেজে উঠল। জুড ফোন তুললেন–হ্যালো।

–ডাক্তার, একা আছেন?

–হ্যাঁ।

–ডাক্তার, আপনার কি মনে আছে আমি আপনাকে বলেছিলাম কে এসবের পেছনে আছে?

–মোটামুটি আন্দাজ করেছি আমি।

–হ্যাঁ।

–সেটা পুরোপুরি ঠিক।

জুডের মনে হল তার সমস্ত মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল প্রবাহ নেমে যাচ্ছে।

–আপনি তা হলে জানেন, কে হ্যানসেন আর ক্যারলকে হত্যা করেছে?

–হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব, জানি। কেন ওরা খুন হয়েছে তাও বলতে পারি। বলুন আর কী প্রশ্ন আছে?

–বলুন তো।

–না-না, ডাক্তার সাহেব, টেলিফোনে নয়। বরং আমরা কোথাও গিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু একা আসবেন আপনি। জুড চমকে উঠলেন একা!

–শুনেছেন তো?

–হ্যাঁ-হ্যাঁ।

তিনি তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন। তারপর অ্যাঞ্জেলির কথা মনে পড়ে গেল। আমার–এখানে আলোচনাটা করলে কেমন হয়?

–না, মনে হচ্ছে ওরা আমাকেও অনুসরণ করছে। আপনাকে ফোন করছি। তেইশ স্ট্রিটের ফাইভ স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি থেকে।

–আমি তাহলে অ্যাঞ্জেলিকে সঙ্গে নিচ্ছি।

মুডির গলা হঠাৎ তীক্ষ্ণ–না-না, কাউকে সঙ্গে আনবেন না। একদম একা চলে আসুন।

ব্যাস, আর সন্দেহ নেই। দৈনিক পঞ্চাশ ডলার দক্ষিণা আর রাহা খরচ দিয়ে তিনি নিজেই এক ঘাতককে নিযুক্ত করেছেন। গলার স্বর সংযত রেখে বললেন–ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি সত্যি জানেন, কে আছে এসবের পেছনে?

–তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ডাক্তার সাহেব, ডন ভিন্টনকে আপনি চেনেন?

মুডি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ডন ভিন্টন। সমস্ত দেহ আর মনের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল কি? বেশ কিছুক্ষণ জুড কোনো কিছু ঠিক করতে পারলেন না। হঠাৎ সজাগ হয়ে অ্যাঞ্জেলির বাড়ির নম্বর ডায়াল করলেন।

–হ্যালো।

–ডাঃ স্টিভেন্স বলছি। মিস্টার মুডি এই মাত্র ফোন করেছিলেন।

–আচ্ছা! কী বলছে সে?

–আমাকে উনি তেইশ স্ট্রিটের ফাইভ স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানিতে দেখা করতে বলছে। আর বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছে একা আসতে।

শুকনো হাসি হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলি–সে তো আমি আগেই জানতাম। শুনুন ডাঃ স্টিভেন্স, অফিস ছেড়ে এক পাও নড়বেন না। আমি ম্যাকগ্রেভির সঙ্গে যোগাযোগ করছি। একসঙ্গে আপনার কাছে যাব।

জুড ফোন নামিয়ে রাখলেন।

.

তেরো

কুড়ি মিনিটের মধ্যে ম্যাকগ্রেভি আর অ্যাঞ্জেলি পৌঁছে গেল। অ্যাঞ্জেলির চোখ দুটো লালচে ভেজা ভেজা। গলার স্বর ভারী। এই অবস্থায় সে বিছানা ছেড়ে এসেছে। জুড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

–মুডির ফোনের কথা আমি লেফটেনান্টকে জানিয়েছি।

–হ্যাঁ, এবার দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ম্যাকগ্রেভির গলায় তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গ। চলুন যাওয়া যাক।

পুলিশের গাড়ি চেপে ওঁরা রওনা হলেন। চালক অ্যাঞ্জেলি। এখন আর ঝিরঝির করে তুষার পড়ছে না। বিকেলের ম্লান সূর্যরশ্মিকে মুছতে মুছতে এগিয়ে আসছে ঝোড়ো মেঘের স্তূপ। হঠাৎ তরবারির আকারে বিদ্যুতের রেখা ফুটে উঠল। মেঘের গুরু গুরু গর্জন শোনা গেল। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপর বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটার আলিঙ্গন।

তেইশ নম্বর স্ট্রিটের কাছাকাছি টেনথ এভিনিউর কাছে এসে ম্যাকগ্রেভি গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল।

–আমরা এখানে নামব। সে ঘুরে তাকাল জুডের দিকে। মুডি আপনাকে বলেছে, কেউ। সঙ্গে থাকবে না?

–না।

–খাপ থেকে রিভলবারটা বের করে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল ম্যাকগ্রেভি। অ্যাঞ্জেলিও তাই করল।

ম্যাকগ্রেভি জুডকে বলল–আমাদের পেছনে পেছনে আসুন।

প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নীচু করে ওরা হাঁটতে থাকলেন। ব্লকের মাঝ বরাবর আসার পর বাড়িটা নজরে পড়ল। চুন বালি খসে গেছে। ইট বেরিয়ে পড়েছে। সদর দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড। তাতে আবছা অক্ষরে লেখা আছে ফাইভ স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি।

সামনে কোনো গাড়ি নেই। মানুষ নেই। পাল্লা ঠেলতে গিয়ে ম্যাকগ্রেভি দেখল তালা বন্ধ। ঘণ্টির বোতাম দেখতে পেল না। কোনোরকম সাড়া শব্দ নেই ভেতরে।

অ্যাঞ্জেলি বিড়বিড় করে বলে সবই তো বন্ধ দেখছি।

–ক্রিস্টমাসের কিছুদিন আগে সব কোম্পানি দুপুরের পর বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাকগ্রেভি জবাব দিল।

–মালপত্র ঢোকানোর জন্য নিশ্চয়ই একটা গেট আছে।

ওদের অনুসরণ করে জুড বাড়ির পেছনে এলেন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। জন মানুষের চিহ্ন নেই।

জুড গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন–মি. মুডি?

জবাবে ভেসে এল হুলো বেড়ালের ক্রুদ্ধ গর্জনের আওয়াজ।

পাটাতনের ওপরে কাঠের দরজা। ওখানে কোনো সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই। ম্যাকগ্রেভি অদ্ভুত দক্ষতায় বিশাল দেহটা নিয়ে সেখানে লাফিয়ে পড়ল। অ্যাঞ্জেলি আর জুড সেখানে উঠলেন। তালা দেওয়া ছিল না। ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঘন অন্ধকার।

–টর্চ এনেছ? ম্যাকগ্রেভি জিজ্ঞাসা করল অ্যাঞ্জেলিকে।

–না।

–রাবিশ। অন্ধকার ঘরেই ওরা ঢুকে পড়লেন। জুড হাঁক দিলেন–মি. মুডি, আমি ডাঃ স্টিভেন্স। কোনো জবাব নেই। কাঠের মেঝের ওপর তিন জোড়া জুতোর শব্দ।

ম্যাকগ্রেভি পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করল–সুইচটা কোথায় গেল দেখ তাড়াতাড়ি। এটাই আমার শেষ কাঠি।

অ্যাঞ্জেলিব দেওয়াল হাতড়ানোর শব্দ জুড শুনতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু ওদের কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। এগিয়ে গিয়ে মুডির নাম ধরে ডাকলেন। সাড়া পেলেন না। অ্যাঞ্জেলির গলা ভেসে এল, এই যে সুইচ। ক্লিক করে একটা শব্দ, কিন্তু আলো জ্বলল না।

জুড দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। দেহের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হাত ঠেকল দরজার হাতলে। টানতেই দরজাটা খুলে গেল। আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি। চৌকাঠের ওপর পা রাখলেন।

–মি. মুডি?

থমথমে নীরবতা। জুড ভাবলেন, লোকটা নিশ্চয়ই এখানে আছে। যদি না থাকে তাহলে সর্বনাশ। ম্যাকগ্রেভি আবার এটাকে একটা রাখাল বালকের চিৎকার বলে ধরে নেবে।

আর এক পা এগোতেই ঠান্ডা শরীর তার মুখের সঙ্গে ঘষটে গেল। চমকে পিছিয়ে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। রক্তের গন্ধ নাকে এসেছে। একটা বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখতে হবে। মনটাকে সজাগ করলেন। সামনে নিকষ কালো

অন্ধকার। আতঙ্কে মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। হৃৎপিণ্ডের গতি অনেক বেড়ে গেছে। কাঁপা হাতে ওভারকোটের পকেট থেকে দেশলাই বের করলেন। পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা

আক্ষেপের পর অনুভব করলেন, হুকে ঝোলানো বিশাল একটা গোরুর কাটা মাথার দিকে, তাকিয়ে আছেন। কাঠিটা নেভার আগে আরও কিছু ঝোলানো পশুর লাশ দেখতে পেলেন। আবছা একটা দরজার দিকে তাঁর নজর গেল। দরজার ওপাশে হয়তো কোনো অফিস ঘর আছে। মুডি সেখানে অপেক্ষা করে আছে তার জন্য?

ঘুটঘুঁটে অন্ধকার গুহাটার আরও গভীরে এগিয়ে চললেন। ঝোলানো পশুদেহগুলো শরীরে ঘষা দিচ্ছিল। অ্যাঞ্জেলি আর ম্যাকগ্রেভি এখনও আসছে না কেন বুঝতে পারলেন না। অন্ধকারে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন মি. মুডি?

এবারও জবাব নেই। পা ফেলতে গিয়ে ঝুলন্ত দেহের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলেন। আঘাতটা সামলে পকেট থেকে দেশলাই বের করলেন। আর একটি মাত্র কাঠি অবশিষ্ট আছে। সেটা জ্বালতেই তার চোখ কপালে উঠে গেল।

ছাদের সিলিং থেকে হুকের সঙ্গে ঝোলানো আছে নরম্যান জেড মুডির প্রাণহীন দেহ। অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি ফুটেছে তার মুখে। মনে হচ্ছে মৃত্যু বুঝি হো-হো করে উল্লাসে হাসছে।

চোদ্দো

করোনারের কাজ শেষ হয়ে গেল। মুডির মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হল। থাকলেন শুধু জুড, ম্যাকগ্রেভি আর অ্যাঞ্জেলি। ওই বাড়ির একটা ছোটো দপ্তরে তারা বসেছিলেন। এর আগে ওই দপ্তরের ম্যানেজার মি. পল মোরেডিকে প্রাক বড়ো দিনের জমজমাট পার্টি থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি জানান, পরের দিন ছুটি থাকায় কর্মচারীদের দুপুরের

পরই কাজ থেকে অব্যহতি দিয়েছিলেন। সাড়ে বারোটার সময় বাড়ির ফটকে তালা লাগানো হয়। তার ধারণা, সেই সময় কেউ ভেতরে ছিল না। প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকায় তার কাছ থেকে বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

এখন প্রায় রাত বারোটা। জুড এই নিয়ে দশবার মুডির ফোন করার ঘটনাটা বললেন। মোটা একটা চুরুট ঠোঁটের ফাঁকে নাচাতে নাচাতে ম্যাকগ্রেভি সব কিছু লক্ষ্য করছিল। এবার বলল সে–আপনার গোয়েন্দা গল্প পড়ার অভ্যেস আছে ডাঃ স্টিভেন্স?

–এ প্রশ্নের অর্থ?

–বোঝেন নি? বেশ তা হলে শুনুন। এই ব্যাপারটায় আমার প্রথম থেকে আপনার ওপর সন্দেহ হয়েছিল। কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আর তাতে ফলটা কী হল বলুন তো? আপনি হঠাৎ নিজেই হত্যাকারীর শিকার হয়ে উঠলেন। প্রথমে দাবী করলেন, একটা গাড়ি আপনাকে চাপা দিতে চেয়েছিল, তাই তো?

অ্যাঞ্জেলি মাঝপথে বলে ওঠে–গাড়িটা কিন্তু সত্যি ওকে ধাক্কা মেরেছিল।

ম্যাকগ্রেভি দাবড়ে দেয় মূখের মতো কথা বলো না। ডাক্তার তার কোনো সহযোগীকে দিয়ে এই কাজটা অনায়াসে করাতে পারে। এরপর আপনি অ্যাঞ্জেলিকে ফোন করে আষাঢ়ে গল্প শোনালেন। বললেন, দুজন লোক আপনার অফিসে চড়াও হয়ে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

জুড বললেন এটা সম্পূর্ণ সত্যি।

–না, ম্যাকগ্রেভির গলা থমথম করে উঠল। ওরা চাবি খুলে ঢুকেছিল। এর আগে আপনি বলেছিলেন, আপনার অফিসের দরজায় দুখানা চাবি আছে। তার একটা থাকত আপনার কাছে, অন্যটা ক্যারল রবার্টসের কাছে।

–হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। ওরা ক্যারলের চাবিটা নকল করেছে।

–মনে আছে আমার। সেই কারণেই চাবিটা আমাকে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হয়েছিল। ওখানকার রিপোর্ট বলছে, চাবিটার নকল ছাপ নেওয়া হয়নি। সুতরাং ওটাকে বাদ দিলে বাকি থাকছে আপনার চাবিটা। তাই তো?

এই খবর শুনে জুড নির্বাক।

–উন্মাদ খুনির তথ্যটা তেমন আমল না দেওয়াতে আপনি রাস্তা থেকে একটা গোয়েন্দাকে খুঁজে আনলেন। সে আপনার গাড়ির ভেতর থেকে বোমা আবিষ্কার করে ফেলল। সেই বোমাটা অবশ্য আপনি আমাদের দেখাতে পারেননি। তার বদলে হুকে টাঙানো যে বস্তুটা আমরা দেখলাম, সেটাও কম চমকপ্রদ নয়।

জুড উত্তেজিত–এর কোনোটির জন্যই আমি দায়ী নই।

ম্যাকগ্রেভি বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে জানেন কি কেন আমি এখনও পর্যন্ত আপনাকে গ্রেপ্তার করিনি? এর একমাত্র কারণ, আমি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে

সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে দেরী হলে একদিন নিশ্চয়ই পারব। পারতে আমাকে হবেই।

জুড হাত তোলেন এক মিনিট, ডন ভিন্টনের ব্যাপারটা তা হলে কী? ভুরু কুঁচকে ম্যাকগ্রেভি–সেটা কে?

মুডি বলছিল, এই লোকটা নাকি এসবের পেছনে আছে।

–ও নামে কাউকে আপনি চেনেন?

–না, ভেবেছিলাম পুলিশ হয়তো চিনতে পারে।

–আমি অন্তত চিনি না। ম্যাকগ্রেভি অ্যাঞ্জেলির দিকে ফিরতে সেও ঘাড় নাড়ে। বেশ ডন ভিন্টনের খোঁজটা তুমি নাও। এফ বি আই, ইন্টারপোল, আমেরিকার বড়ো বড়ো শহরে পুলিশ চিফদের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

পরের দিন সমস্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মুডির খুন হবার খবর ছাপা হল। অফিসে আসার পথে জুড একটা কাগজ কিনলেন। পুলিশের সঙ্গে তার নামটাও স্বাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইস, অ্যানি কী ভাবছে কে জানে।

বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ শুনলেন। অ্যাঞ্জেলি ভেতরে ঢুকল। তাকে আরও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

–ডন ভিন্টনের খোঁজ পাওয়া গেল? জুডের ব্যাকুল প্রশ্ন।

–না। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে অ্যাঞ্জেলি, এফ বি আই, ইন্টারপোল থেকে শুরু করে সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। টেলিফোন গাইড থেকে আমরা এগারো জন ডন ভিন্টনের নাম পেয়েছি। এর মধ্যে পাঁচজনের নামের উচ্চারণ ভিন্টন, চারজনের ভিন্টেন আর দুজনের ভিন্টিন। তবু আমরা একই উচ্চারণ করে নিয়ে পাঁচজনকে বিশেষ সন্দেহের তালিকায় ফেলে দিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওদের একজন পঙ্গু, একজন পুরুতমশাই, একজন ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর একজন ফায়ারম্যান। খুনের সময় সে ডিউটিতে ছিল। আর শেষের জন একটা দোকান চালায়। যার বয়স কম করে ধরলেও আশি। আপনি নামটা ঠিক শুনেছিলেন তো?

জুড বললেন–হ্যাঁ, এতে কোনো ভুল নেই।

অ্যাঞ্জেলি–তাহলে বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই।

–আপনার কি ধারণা, ম্যাকগ্রেভি শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে?

–সম্ভবত। আচ্ছা চলি।

–মনে হয় আমি একটা সূত্র পেয়েছি।

অ্যাঞ্জেলি ঘুরে দাঁড়িয়ে–বলুন।

জুড টেরির পূর্ব ইতিহাস খুলে বললেন। অ্যাঞ্জেলি ঘাড় নেড়ে বলল–নাঃ, এটা মেনে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক, নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো। দেখা যাক, চেষ্টা করে।

হঠাৎ কী ভেবে পকেট থেকে রিভলবার বের করে বলল–এটা আপনার কাছে রাখুন। দরকার হতে পারে। সাবধানে রাখবেন। গুলি ভরা আছে।

–ধন্যবাদ মিস্টার অ্যাঞ্জেলি। ওটা আমার দরকার নেই। তেমন প্রয়োজন পড়লে নিজের কাছে যা আছে তাই দিয়ে লড়াই করব।

বাইরের ঘরের দরজা. খোলার শব্দ হতে অ্যাঞ্জেলি ফিরে তাকাল কারোর কি আসার কথা ছিল?

–না, আজ সকলকে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

রিভলবার হাতে অ্যাঞ্জেলি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। চৌকাঠের ওপাশে পিটার হ্যাডলি। তার চোখে মুখে বিভ্রান্তির স্পষ্ট ছাপ।–কে আপনি?

জুড় তাড়াতাড়ি অ্যাঞ্জেলির পাশে এসে দাঁড়ালো–ও, ঠিক আছে, ঠিক আছে। উনি আমার বন্ধু।

–এসব কী হচ্ছে? পিটার জানতে চাইলেন।

–এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ডিটেকটিভ অ্যাঞ্জেলি আর উনি আমার বন্ধু পিটার হ্যাডলি। ।

করমর্দন করার পর অ্যাঞ্জেলি বলল আচ্ছা, এখন আমি যাই। তাহলে আপনার। এসব পছন্দ হবে না, তাই তো?

রিভলবারটা ইঙ্গিত করল সে।

জুড মাথা নাড়লেন–না, ধন্যবাদ।

–সাবধানে থাকবেন, অ্যাঞ্জেলি বেরিয়ে গেল।

.

পনেরো

পিটার হ্যাডলির সঙ্গে লাঞ্চ সেরে অফিসে ফিরে এসে জুড আবার টেপ নিয়ে বসলেন। একের পর এক টেপ শুনতে লাগলেন। কাগজে মন্তব্য লিখলেন। বিতৃষ্ণা, শূন্যতাবোধ একাকীত্বের যন্ত্রণা, আত্মগরিমা, আত্মবেদনা, আতঙ্ক, বিকৃত কাম।

তিনঘণ্টা পরে একটি নতুন নাম তিনি তালিকায় যোগ করতে পারলেন। ব্রুস বয়েড, জন হ্যানসেনের সর্বশেষ সহচর। কী ভেবে হ্যানসেনের টেপটা আরও একবার চালিয়ে দিলেন।

–আমার মনে হয় ব্রুসকে প্রথমবার দেখেই আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। অত সুন্দর পুরুষ এর আগে কখনও দেখিনি।

–ওর স্বভাব কী রকম ছিল? আপনার কথাবার্তা উনি শুনতেন কি? নাকি আপনার ওপর জোর করতেন?

–ও সব সময় কর্তৃত্ব করতে চাইত। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝামেলা হত।

-কী রকম?

–নিজের শক্তি সম্পর্কে ব্রুসের কোনো ধারণাই ছিল না। মাঝে মাঝে ও আমার পিঠে এমনভাবে চাপড় মারত, মনে হত, আমার শিরদাঁড়াটা বোধ হয় ভেঙে গেল। অথচ, এটাই ওর সোহাগ দেখানোর নমুনা। তারপর ধরুন হাত নাড়ানোর ব্যাপার। মনে হবে, আঙুলগুলো গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়। আসলে ব্যথা দেওয়াতেই ওর আনন্দ।

জুড টেপ বন্ধ করলেন। সমরতি ব্যাপারটা.যদিও তার কল্পনায় হত্যাকারী মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু জন হ্যানসেনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় ব্রুস বয়েডের নামটা উপেক্ষা। করা যাচ্ছে না। আর টেরি ওয়াশ বার্ন? হলিউডে ফোন করার ব্যাপারটা সে কেন চেপে গেছে? জন হ্যানসেন আর ক্যারল রবার্টসের হত্যাকারী কি এরা কেউ?

***

সার্টন প্লেসে টেরি ওয়াশবার্নের ফ্ল্যাটের বৈঠকখানাতে জুড বসে আছেন। সমস্ত ঘরে গোলাপির বাড়াবাড়ি। দেওয়াল, আসবাব, পর্দা সব কিছু। একটু বাদে টেরি ঢুকল। পরনে গোলাপি রঙের স্বচ্ছ রাত্রিবাস। তার আড়াল থেকে প্রকটিত যৌবন উচ্ছ্বাস। তলাতে আর কিছু পরেনি সে।

–শেষ অব্দি তুমি তাহলে এলে। আনন্দে ঝলমল করছে টেরির মুখ।

–আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

–সব শুনেছি। কিন্তু আপনি, আজ্ঞেগুলো আজকের মতো বিদায় দাও তো। ছোট্ট একটা ড্রিঙ্কস বানিয়ে নিই।

–না, ধন্যবাদ।

–বেশ তো, তুমি নিজে না যাও, আমি নিজের জন্য এক কাপ বানাব।

ঘরের একপ্রান্তে একটা আলমারির কাছে সে এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা পানীয় নিয়ে আবার ফিরে এসে জুডের গা ঘেঁষে বসল।–আর সামলাতে পারলে না তো। আমি জানতাম, তুমি একদিন আসবে।

বলতে বলতে ডাক্তারের প্যান্টের ওপর হাত রাখল।

জুড দুহাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরলেন–টেরি, আমি তোমার সাহায্য চাই।

–সে তো হবে আমি জানি গো। দেখ না, এমন কায়দা দেখাব, তুমি সারা জীবন আমাকে মনে রাখবে।

–টেরি শোনো, আমাকে একজন খুন করতে চায়।

টেরির চোখ দুটো বিস্ময়ে বড়ো বড়ো–অ্যাঁ, কী বলছ? তোমাকে খুন করতে চায়? কে সে?

–আমার রোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কেউ।

–কিন্তু কেন?

–সেটাই তো আমি খুঁজতে চেষ্টা করছি। টেরি, আচ্ছা, তোমার বন্ধুবান্ধবী কখনও খুন-টুন নিয়ে আলোচনা করে? খেলাচ্ছলে? অনেক সময় এরকম হয় তো।

টেরি মাথা নাড়ল–কই নাতো।

–ডন ভিন্টন নামে কাউকে তুমি চেনো?

–ডন ভিন্টন? নাতো।

-আচ্ছা খুনের ব্যাপারে তোমার নিজের অভিমত কী? মানে ব্যাপারটা তোমার কাছে কেমন লাগে?

জুড অনুভব করলেন, মেয়েটির শরীরটা সামান্য কেঁপে উঠল। নাড়ির গতি বেড়ে গেল। বলতে পারব না।

–ভেবে বলল। হত্যা করার কথা চিন্তা করলে তুমি কি উত্তেজনা অনুভব করো?

–না, মোটেই না।

–আচ্ছা, হলিউডে তুমি যে একজনকে খুন করেছিলে, একথা কোনদিন আমাকে বলোনি কেন?

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টেরি গলা চেপে ধরতে গেল। জুড তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরলেন।

–হ্যারামজাদা ইতর শুয়োরের বাচ্চা। সেটা কুড়ি বছর আগের ঘটনা, তাহলে এই মতলবেই এখানে আসা। বেরিয়ে যান। এখুনি বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে।

টেরি কান্নার আবেগে তখন ভেঙে পড়েছে।

–আমি দুঃখিত। জুড বেরিয়ে গেলেন।

***

গ্রিন উইন ভিলেজে একটা গোটা বাড়ির মালিক ব্রুস বয়েড। সাদা পোশাক পরা একজন ফিলিপাইন পরিচারক দরজা খুলে দিল। জুডকে বৈঠকখানায় বসিয়ে সে কোথায়

যেন হাওয়া হয়ে গেল। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কেটে গেছে। তার পাত্তা নেই। জুড বিরক্তিবোধ করছিলেন। তিনি ভাবলেন, অ্যাঞ্জেলিকে খবর দেওয়া উচিত ছিল।

শেষ পর্যন্ত চাকরটি হাজির হল। জানাল, সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আসুন।

জুড তাকে অনুসরণ করলেন। দোতলার একটা সাজানো গোছানো ঘরে ঢুকলেন। বয়েড টেবিলে লেখায় ব্যস্ত। ভারী সুন্দর চেহারা। যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। টিকলো নাক, তুলি দিয়ে আঁকা চোখ। পাতলা সুন্দর দুটি ঠোঁট। মাথার সোনালি চুলগুলো কোঁকড়ানো আর ঢেউ খেলানো।

জুডকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। অন্তত ছফুট তিন ইঞ্চি। চওড়া কাঁধ আর বুক। প্রথম দর্শনে মনে হয়, সে একজন ফুটবল খেলোয়াড়। তার পক্ষে খুন করা কি সম্ভব? হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। অ্যাঞ্জেলিকে খবর না দিয়ে আসার জন্য জুড আরও একবার অনুতপ্ত হলেন।

বয়েডের গলা নরম এবং মার্জিত আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা চাইছি ডাঃ স্টিভেন্স।

রয়েডের বাড়ানো হাতটা ধরতে যেতেই জুডের মুখের ওপর একটা সজোর আঘাত এসে পড়ল।

অপ্রত্যাশিত এ আঘাতটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। একটা বাতি দানের ওপর পড়ে গেলেন।

–মাফ করবেন আমাকে। উঠুন, একটা ড্রিঙ্কস দেব?

জুডের তখনও মাথা ঘুরছে। কোনোরকমে মেঝে থেকে দেহটা টেনে তুলতে গেলেন। পরক্ষণেই একটা বুটের লাথি তাকে আবার ধরাশায়ী করে দিল।

–আমি আপনার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলাম। বয়েড বলল, না-না, কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। আমি জানি, কেন আপনি এসেছেন। জনির বিষয়ে আমার কাছে কিছু শুনতে চান, তাই তো?

জুড মাথা নাড়বার চেষ্টা করলেন। আবার বুটের লাথি এসে পড়ল তার মাথায়। –আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছেন আপনি। আপনি বুঝিয়েছেন, এ ভালোবাসা নোংরা। আমাদের সম্পর্ক অবৈধ। বলুন, কে দিয়েছে আপনাকে এই অধিকার? নিজেকে কি আপনি ভগবান ভাবতে শুরু করেছেন? জনিকে আমি হারিয়েছি। আপনি তাকে খুন করেছেন। এবার আমার হাতে আপনার মৃত্যু হবে।

আবার একটা সবুট লাথি আছড়ে পড়ল কানের পাশে। রঙিন ফুলঝুড়ির ফোয়ারা দেখতে দেখতে জুড জ্ঞান হারালেন।

সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা

ষোল

সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথার ভেতরটা কেউ যেন খুবলে খাচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও আহত পশুর গোঙানি শব্দ শুনতে পেলেন জুড। চোখ মেলে তাকালেন। অচেনা ঘর, অজানা পরিবেশ। এক কোণে ব্রুস বয়েড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নড়াচড়ার শব্দ শুনে সে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

–সব দোষ আপনার। আপনার পাল্লায় না পড়লে জনি বেঁচে যেত। আমার সঙ্গে থাকলে কেউ তাকে মারতে পারত না।

হঠাৎ জুডের মনে হল, তিনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন। ব্রুস বয়েড কখনোই ডন ভিন্টন নয়। যদি হত, তাহলে এতক্ষণ তিনি জীবিত থাকতেন না।

ধীরে ধীরে তিনি বললেন আমি কিন্তু হ্যানসেনকে একবারও বলিনি, আপনাকে ত্যাগ করতে। ওটা উনি নিজেই ভেবেছিলেন।

–আপনি মিথ্যেবাদী।

–উনি আমার কাছে আসার আগেই আপনাদের মধ্যে গোলমাল চলছিল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর–হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সর্বক্ষণ ঝগড়া বাঁধত।

–ওর বিবেক চাইছিল, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করার জন্য উনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

–হ্যাঁ, বয়েড ফুঁপিয়ে ওঠে। ও আমার কাছে সব বলত। আমি ভাবতাম, ও বোধ হয় আমাকে শাস্তি দিতে চাইছে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

–উনি কিন্তু তখনও বন্ধু হিসেবে আপনাকে ভালোবাসতেন।

বয়েড সরাসরি তাকাল আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? আবার ফিরিয়ে দেবেন আমার স্বাভাবিক জীবন?

–সেটা নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছা শক্তির ওপর। আমি আপনাকে মনোবৈজ্ঞানিক সাহায্য দিতে পারি।

–বলুন তাহলে কবে থেকে সেটা শুরু করব।

–আগামী সোমবার আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

ট্যাক্সি নিয়ে ফ্ল্যাটের দিকে ফিরতে ফিরতে জুড ডন ভিন্টনের কথা চিন্তা করছিলেন। ওই লোকটা কে? অপরাধী যদি হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশের খাতায় নাম নেই কেন? তাহলে কি অন্য কোনো নামে সে পরিচিত? না, মুডি স্পষ্টই একথা বলেছে। তবে, একথা নিশ্চিত ডন ভিন্টন যেই হোক, টেরি বা বয়েডের মধ্যে কেউ নয়। তাই অনায়াসে সন্দেহের তালিকা থেকে ওদের বাদ দেওয়া যায়। তার মানে? আমার জীবনের ওপর

আর একটা আঘাত আসছে? আজ অথবা আগামী কাল সেই আঘাত থেকে আমি বাঁচব তো?

ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। দারোয়ান এগিয়ে এল তাকে সাহায্য করতে। জুড ঘুরে তাকালেন। একী, এ লোকটাকে তিনি তো আগে কখনও দেখেননি।

.

সতেরো

লোকটা বেশ লম্বা। গায়ের রং ঈষৎ বাদামী, মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। গভীর কোটরাগত দুটি কালো চোখ। গলায় আড়াআড়ি একটা ক্ষতচিহ্ন। মাইকের পোশাকটা, সে পরেছে। কিন্তু সেটা ভীষণভাবে এঁটে বসেছে তার গায়ে।

ট্যাক্সি চলে গেল। জুড শান্ত মাইক কোথায়?

–ডাক্তার সাহেব ছুটিতে।

ডাক্তার সাহেব? তার মানে লোকটা আমার পরিচয় জানে।

কিন্তু মাইক এখন ছুটি নেবে কেন?

লোকটার মুখে পরিতৃপ্তির হালকা হাসি। জুড রাস্তার দিকে তাকালেন। চারপাশ ধু ধু করছে। জন প্রাণীর চিহ্ন নেই। সাহায্যের প্রত্যাশা বৃথা। দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়।

ভেতরে ঢোকাই ভালো। পায়ে পায়ে লিফটের দিকে এগিয়ে চললেন। ওখানে এডিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার নাম ধরে ডাকলেন।

আবার বিস্ময়, যে ফিরে তাকাল, তাকে নতুন দারোয়ানটার একটা ছোটো সংস্করণ বলা যেতে পারে। তফাতের মধ্যে গলায় ক্ষত চিহ্নটা নেই। অর্থাৎ ওরা দুজন আপন ভাই।

–ওপরে যাবেন তো? লোকটা খুব অমায়িক।

জুড ম্যানেজারের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন আমি একবার মিঃ কারজের সঙ্গে দেখা করব।

লম্বা নোকটা আচমকা পেছন থেকে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল–উনি এখন ব্যস্ত আছেন ডাক্তার সাহেব।

লিফটের সামনে দাঁড়ানো লোকটা বলল চলুন, আপনাকে ওপরে নিয়ে যাই।

–না, আমি আগে—

–আপনাকে যা বলা হচ্ছে, তাই করুন।

আচমকা হিমেল হাওয়ার ঝাঁপটা ছুটে এল। লবির দরজা খুলে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ঢুকল। হৈ হৈ করে ওরা লিফটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

–ও, আজকের আবহাওয়া সাইবেরিয়াকে হার মানিয়েছে।

–যাই বলো দিনটা দারুণ গেল।

–আজ কিন্তু তোমার হাতে এক পেগ না খেয়ে নড়ছি না।

–আজ খুব দেরী হয়ে গেছে জর্জ।

–হোক দেরী। আরে বাবা, শরীরটা একটু গরম না করে শূন্য ডিগ্রির মধ্যে বেরোব কেমন করে বলো তো?

–কিন্তু এক পেগের বেশী নয়। মনে থাকে যেন।

–তাই হবে।

হাসতে হাসতে ওরা লিফটের খাঁচায় ঢুকল। জুড চট করে ওদের সঙ্গে মিশে গেলেন। বাইরে দু-ভাইয়ের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি হল। তারপর ছোট্ট একটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছোটো ভাই খাঁচায় ঢুকে পড়ল। জুডের ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। ওরা যদি তার আগে নেমে যায়, তাহলে কী হবে? পরে নামলে হয়তো বাঁচবার একটা চেষ্টা করা যাবে।

–বলুন কতলা?

সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটা দুষ্টু দুষ্টু হাসল।

–এত রাতে দু-দুটো অচেনা পুরুষ মানুষকে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে স্বামীকে কী বলব বুঝতে পারছি না। লিফট চালকের দিকে ফিরে দশ।

ঢোক গিলে জুড–পাঁচ।

পাঁচতলায় লিফট থামল। জুড নামলেন, দরজা বন্ধ হল। কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে চললেন। পাঁচ মিনিট, এর মধ্যে নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। চাবি খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। ভেতর থেকে লোহার শিকলটা তুলতে গিয়ে তার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। গোটা চেনটা উপড়ে এল হাতে। ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেলিফোনের কাছে চলে এলেন। এখন অ্যাঞ্জেলিই ভরসা, কিন্তু সে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে শুয়ে আছে। কী বলবেন তাকে? নতুন দারোয়ান আর লিফটচালক বাড়িতে এসে তাঁকে খুন করতে চায়?

রিসিভার হাতে অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকাতে থাকলেন। টেলিভিশনের ছোট সেটটার দিকে নজর পড়ল। হাত বাড়িয়ে চাবি ঘোরালেন। লবি ফঁকা। তখুনি একজনের কথা মনে পড়ল। ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলেন। ওপাশে ফোনের ঘণ্টা পাঁচবার বাজল। একজন সাড়া দিল–হ্যালো।

অসংলগ্নভাবে জুড কথা বলছিলেন। দৃষ্টি তখন টেলিভিশনের পর্দায়। ফাঁকা লবির দূর প্রান্তে তিনি দুজনকে দেখতে পাচ্ছেন। বলিষ্ঠ পায়ে তারা কাছে, ক্রমশ কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

.

ওরা নিঃশব্দে জুডের ফ্ল্যাটের দরজার দুপাশে এসে দাঁড়াল। লম্বা লোকটার নাম রকি। সে দরজায় আলতো ঠেলা দিল। তালা লাগালো। পকেট থেকে সেলুলয়েডের কার্ড বের করল। চাবির ফোকরে ঢুকিয়ে ভাইয়ের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল। দুজনেই কোমর থেকে সাইলেন্সর লাগানো রিভলবার বের করল। রকির কারসাজিতে তালাটা খুলে গেল। দরজা খুলে রিভলবার তাক করে ভেতরে ঢুকে গেল।

সামনে আরও তিনটে বন্ধ দরজা। জুডের চিহ্ন নেই। ছোটো ভাই নিক এগিয়ে গেল প্রথম দরজার কাছে। ওটাও তালা বন্ধ। দাদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। রিভলবারের নল রেখে ট্রিগার টিপল তালার ওপর, কোনো শব্দ হল না। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল শোবার ঘর। রিভলবার ঘোরাতে ঘোরাতে ওরা সেখানে ঢুকে পড়ল।

কেউ সেখানে নেই। নিক আলমারিগুলো খুলে খুলে দেখতে শুরু করল। রকি এল বৈঠকখানায়। কোনো ব্যস্ততা নেই ওদের চলাফেরার মধ্যে। ওরা জানে, লক্ষ্য বস্তুকে যে, কোনো মুহূর্তে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে।

প্রথম ঘরটা শেষ হল, দ্বিতীয় দরজার সামনে পৌঁছে গেল নিক। ওটাও তালাবন্ধ। একইভাবে তালাটাকে ধ্বংস করে ভেতরে ঢুকল। এই ঘরটা একেবারেই ফাঁকা। তৃতীয় দরজাটির দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ টেলিভিশনের পর্দার ওপর চোখ পড়ল। রকি তার ভাইয়ের হাত ধরে ফেলল। ওরা দেখল, একতলার লবিতে তিনজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। সাদা পোশাক পরা দুজন একটা স্ট্রেচার ঠেলছে। তৃতীয় জনের হাতে ডাক্তারি ব্যাগ।

–কী আবার হল?

–মাথা ঠাণ্ডা রাখ রকি। নিশ্চয়ই কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কয়েক শো ফ্ল্যাট আছে এ বাড়িতে।

স্ট্রেচার শুদ্ধ তিনজন লিফটের ভেতর ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

–মিনিট দুই অপেক্ষা করা যাক। নিক বলল। মনে হচ্ছে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তাহলে পুলিশ আসবে।

–শালা ফাটা কপাল কাকে বলে।

–অত ভাবছিস কেন? স্টিভেন্স তো আর পালাতে পারছে না। দড়াম করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। স্ট্রেচার নিয়ে হুড় মুড় করে ঢুকেছে তিনজন। রকি আর নিক চোখের পলকে বন্দুক দুটো ওভার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

নিককে লক্ষ্য করে চিকিৎসকটি প্রশ্ন করল–মারা গেছে?

–কে?

–যে লোকটা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। বেঁচে আছে, না মারা গেছে?

নিক রকির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল আপনারা ভুল অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছেন?

চিকিৎসক তাদের উপেক্ষা করে বন্ধ দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল তালা দেওয়া দেখছি। এটা খুলতে আমাকে সাহায্য করবেন?

দুভাই আগ্রহ দেখাল না। চিকিৎসক নিজেই তার সহযোগীর সাহায্যে কাঁধের ধাক্কায় দরজাটা ভেঙে ফেলল।

–স্ট্রেচার নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি। বিছানায় শোওয়া জুডকে লক্ষ্য করে সে বলল,–এখন ভালো বোধ করছেন তো?

জুড কোনোরকমে চোখ মেলে তাকানোর ভান করলেন–হাসপাতাল।

রকি আর নিকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তাকে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তোলা হল। ওখানে থাকা অর্থহীন ভেবে দুভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিকিৎসকের মুখে হাসি ফুটেছে। জুডকে লক্ষ্য করে বলল–এবার বল, কেমন লাগছে?

প্রত্যুত্তরে জুড হাসতে গেলেন। কিন্তু হাসিটা প্রকাশ পেল না। তিনি বললেন–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ পিট।

পিটার হ্যাডলি তার দুই সহযোগীকে ইঙ্গিত করলেন চলল, এবার যাওয়া যাক।

.

আঠারো

হাসপাতাল ঘরটা আলাদা। নার্স সেই আগের জন। জুড. চোখ খুলে তাকে পাশে বসে থাকৃতে দেখলেন।

মেয়েটি মৃদু হাসল। বলল–উঠেছেন তাহলে। দাঁড়ান ডাঃ হ্যারিসকে ডেকে আনি।

–আসতে পারি। ডাঃ সিমুর হ্যারিস ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন–এই রকম আরও দু-চারটে খদ্দের আমাদের দরকার। তুমি কি জানো, ব্যান্ডেজ আর সেলাই বাবদ আমরা তোমার কাছ থেকে কত টাকা বিল করেছি? এবার ভাবছি, তোমার জন্য কিছু কনসেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাক ঘুম কেমন হল?

জুড হাসলেন–দারুণ ঘুমিয়েছি।

–সুসংবাদ, ভালো কথা। লেফটেনান্ট ম্যাকগ্রেভি একবার দেখা করতে চান। উনি খুবই হন্তদন্ত হয়ে এখানে এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নাকি খুবই জরুরি।

অর্থাৎ ম্যাকগ্রেভি তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়? জুডের হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছে। অ্যাঞ্জেলি এখন অসুস্থ। কদিন অফিসে আসছে না। এই সুযোগটা ম্যাকগ্রেভি নিশ্চয়ই ছাড়বে না। কিন্তু এত সহজে তিনি হার মানতে রাজী নন। মনে মনে একটা মতলব ভেজে নিয়ে বললেন এখানে নাপিত পাওয়া যাবে? দাড়িটা কামানো দরকার।

ডাক্তার হ্যারিস অবাক চোখে তাকালেন–নিশ্চয়ই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জুড লাফিয়ে উঠলেন। টানা বিশ্রামের পর শরীরটা ঝরঝরে। তিন মিনিটের মধ্যে পোশাক বদলে ফেললেন তিনি। দরজা ফাঁক করে বারান্দার এপাশ ওপাশ তাকালেন। কেউ লক্ষ্য করছে না দেখে সিঁড়ির মুখে চলে গেলেন।

আর ঠিক তখনই লিফটের দরজা খুলে ম্যাকগ্রেভি লবিতে পা রাখল।

দুমদুম করে পা ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ল ম্যাকগ্রেভি। প্রথমেই নজরে পড়ল খালি বিছানাটা। যা পাখি উড়ে গেছে। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ তাকাল। টেলিফোনের কাছে গিয়ে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল।–হ্যালো ম্যাকগ্রেভি বলছি। সমস্ত থানায় খবর পাঠাও ডাঃ স্টিভেন্স...।

পুলিশের গাড়িটায় রেডিও কণ্ঠস্বর এক ঘেয়ে সুরে বলে চলেছে দশ নম্বর, দশ নম্বর। সমস্ত গাড়িকে বলা হচ্ছে পাঁচ নম্বরকে।

অ্যাঞ্জেলি সুইচ বন্ধ করে দিল আর কে জানে আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

জুড মাথা নেড়ে–কেউ না।

অ্যাঞ্জেলি আশ্বস্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় নাড়ল।

জর্জ ওয়াশিংটন সেতু ছাড়িয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে নিউ জার্সির দিকে।

অ্যাঞ্জেলিকে পাশে পেয়ে জুড অনেকটা স্বস্তি বোধ করছিলেন।

–যাক ব্যাপারটা যে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এটাই সব থেকে আনন্দের কথা।

জুড বললেন–এটা একটা পেশাদার খুনেদের সংস্থা। এতে একাধিক লোক জড়িত আছে, তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। মুডি ঠিকই অনুমান করেছিল।

বড়ো রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে অ্যাঞ্জেলি সরু গলিতে গাড়ি ঢোকাল।

জুড প্রশ্ন করলেন আমার কথা আপনার বন্ধু কি শুনেছেন?

–হ্যাঁ, আমি ফোনে জানিয়ে দিয়েছি, বলতে বলতে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল অ্যাঞ্জেলি। তারপর আরও মাইলখানেক এগিয়ে একটা বৈদ্যুতিক ফটকের সামনে গেল। জুড লক্ষ্য করলেন, ছোট্ট দূরদর্শন ক্যামেরা গেটের ওপর লাগানো আছে। কয়েক সেকেন্ড পরে নিজে থেকেই পাল্লা দুটো খুলে গেল। গাড়িটা ভেতরে ঢোকার পর বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে অনেকখানি লম্বা রাস্তার শেষ প্রান্তে জুড একটা বিরাট ছাদকে উঁকি মারতে দেখলেন।

.

উনিশ

পুলিশের সদর দপ্তরের বিশাল ঘর। শব্দ ঢুকতে পারে না, এমনই ব্যবস্থা। ডজন খানেক পুলিশ অফিসার বিশাল সুইচ বোর্ডকে ঘিরে বসে আছে। ওদের সজাগ দৃষ্টি ছজন অপারেটরের ওপর। ডাঃ জুড স্টিভেন্স আর ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক অ্যাঞ্জেলির সন্ধান করতে

তারা সমস্ত দেশে জাল ছড়িয়েছে। অপারেটরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামান্যতম খবর পেলেই যেন তা অফিসারদের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য চলে যাবে : নিয়ন্ত্রণ বিভাগে। শুরু হবে পুলিশি তৎপরতা।

ক্যাপ্টেন বারটেলি ঢুকলেন অপরাধ দপ্তরের প্রধান অ্যালেন্স রিভানের ঘরে। একটু বাদে ম্যাকগ্রেভি সেখানে এসে হাজির হল। বারটেলি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

ম্যাকগ্রেভি বললেন–ডাঃ স্টিভেন্সের অফিস বাড়ির উল্টোদিকে আমরা একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর সন্ধান পেয়েছি। দারোয়ানি করে লোকটা। সে বলছে বুধবার রাতে দুজন লোককে

সে ওই বাড়ির তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে।

–সনাক্তকরণের কিছু ব্যবস্থা।

–হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেলির ছবিটা সে দেখিয়েছে।

–কিন্তু বুধবার রাতে তার তো সর্দি জ্বরে শয্যাশায়ী থাকার কথা।

–ঠিক, তবে দ্বিতীয় লোকটাকে সে দেখতে পায়নি।

সুইচ বোর্ডে অসংখ্য লাল আলো জ্বলছে। একটার পাশে প্লাগ গুঁজে দিয়ে একজন অপারেটর ক্যাপ্টেন বারটেলিকে লক্ষ্য করে বলল–আপনার কল স্যার। নিউজার্সি হাইওয়ে টহলদার বাহিনী থেকে বলছে।

ক্যাপ্টেন বারটেলি রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে–ক্যাপ্টেন বলছি। হ্যাঁ ঠিক বলছেন–শুনুন, আপনাদের সমস্ত ইউনিটকে ওখানে কাজে লাগিয়ে দিন। রাস্তা অবরোধ করুন। পালাবার কোনো পথ যেন ভোলা না থাকে। সবসময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ধন্যবাদ।

ফোনটা অপারেটরের হাতে দিয়ে–একটা সূত্র পাওয়া গেছে। নিউজার্সির একজন টহলদার অরেঞ্জবার্গের কাছেই অ্যাঞ্জেলির গাড়িটা দেখেছে।

–আর স্টিভেন্স?

–সেও সঙ্গে আছে।

ম্যাকগ্রেভি চুরুট ধরিয়ে ডাঃ স্টিভেন্সের বন্ধু ডাঃ পিটার হ্যাডলির সঙ্গে কথা বললাম। তিনি একটা মজার কথা শোনালেন। কয়েকদিন আগে বন্ধুর সঙ্গে অফিসে দেখা করতে গিয়ে তিনি অ্যাঞ্জেলিকে বন্দুক হাতে দেখেছেন। অ্যাঞ্জেলি অবশ্য তাকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, ডাঃ হ্যাডলি হঠাৎ এসে পড়াতেই সে যাত্রায় ডাঃ স্টিভেন্সের প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল।

সুলিভান প্রশ্ন করলেন–কিন্তু অ্যাঞ্জেলির ওপর আপনার প্রথম সন্দেহ কীভাবে হল?

–কয়েক জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার অনাবশ্যক ঝগড়াঝাটির পর থেকেই তাকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করি। তদন্ত করতে গিয়ে দেখি, তারা কেউ ওর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাইছে না। আমার কেমন যেন মনে হল, ওরা কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ভয়

পেয়েছে। ব্যাপারটা আমি অ্যাঞ্জেলির কাছে চেপে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই তার ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করি। এর কিছুদিন বাদে হ্যানসেন খুন হল। অ্যাঞ্জেলি সেই সময় নিজে আমার কাছে এল। এই কেসে আমার পার্টনার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিল। এমন কী এর জন্য ক্যাপ্টেন বারটেলির কাছে পর্যন্ত আবেদন করেছিল। যাই হোক তাকে আমি নিলাম। তখনও আমি ডাঃ স্টিভেন্সের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত নই। আমি একটা চাল চেলে ওকে বললাম, ডাক্তারকে আমি সন্দেহ করি আর তাকে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ফাসাতে চাই। আমার ধারণা ছিল সে এতে আরও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আমার দিক থেকে সন্দেহ মুক্ত হতে পেরেছে ভেবে সে ভালো ভাবে তার পথে হাঁটবে।

–কাজ হল তাতে?

–না, বরং আমাকে অবাক করে অ্যাঞ্জেলি ডাঃ স্টিভেন্সকে আড়াল করতে শুরু করল। আমি যেন কিছুতেই তাকে জেলে ভরতে না পারি তার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সুলিভান বিভ্রান্ত–কিন্তু কেন?

–তার কারণ ডাক্তারকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল অ্যাঞ্জেলির। জেলে গেলে সেটা সম্ভব হত না।

বারটেলি বললেন–অ্যাঞ্জেলি আমার কাছে এসেছিল। আমাকে সে বোঝায় আপনি নাকি অনর্থক ডাঃ স্টিভেন্সকে ফাসাতে চেষ্টা করেন।

–ক্যাপ্টেন আমাকে খবরটা জানিয়ে দেওয়াতে আমি আমার সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। ডাঃ স্টিভেন্স এরপর মুডি নামে একজন বেসরকারি গোয়েন্দার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই লোকটার একজন ব্যবসাদার মক্কেলের সঙ্গে অ্যাঞ্জেলির ঝামেলা হয়েছিল। মুডি কোর্টে জানায়, তার মক্কেলকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। আসলে তখন থেকেই সে অ্যাঞ্জেলির পরিচয়ের আঁচ পেয়েছিল। তাই ডাঃ স্টিভেন্সের গাড়ির বোমাটা সে সরাসরি এফ বি আই-এর কাছে পাঠিয়ে দেয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

–অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, সে সন্দেহ করেছিল, অ্যাঞ্জেলির হাতে গেলে এটা ঠিক মতো পরীক্ষা হবে না। তাই তো?

–আমার তাই ধারণা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এফ বি আই-এর কাছে পাঠানো মুডির রিপোর্টের কপিটা অ্যাঞ্জেলির হাতে পড়ে যায়। ওটা দেখেই সে বুঝতে পারে, মুডি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। এছাড়া মুডি আর একটা ভুল করেছিল, ডাঃ স্টিভেন্সের কাছে ডন। ভিন্টনের নামটা প্রকাশ করে সে।

–কেন?

–কারণ ডন ভিন্টন হল লা কোসানোস্ত্রার একটা গুপ্ত সংস্থার সর্দারের নাম। অ্যাঞ্জেলি। সেই সংস্থার সঙ্গে জড়িত।

–কী করে বুঝলেন?

–যে ব্যবসাদারদের কথা বললাম, তাদের কাছে ডন ভিন্টন নামটা বলতেই যেন ম্যাজিক ঘটে গেল। ওরা গড় গড় করে সব বলে গেল। শুনলাম অ্যাঞ্জেলি ওই সংস্থার হয়ে ভয় দেখায়। নিয়মিত তোলা আদায় করে।

–কিন্তু ডাঃ স্টিভেন্সকে তারা খুন করতে চাইছে কেন?

সুলিভান এবার অধৈর্য।

–তা বলতে পারছি না। সেটা জানার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে। অ্যাঞ্জেলির পেছনে আমরা যেসব লোককে লাগিয়ে ছিলাম, তাদের সে ঝেড়ে ফেলেছে। আর ডাঃ স্টিভেন্সকে সতর্ক করতে গিয়ে দেখি তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন।

সুইচ বোর্ডের একজন অপারেটর বলে উঠল ক্যাপ্টেন, বারটেলি।

বারটেলি ফোন ধরলেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। গাড়িটা ওদের চোখের আড়ালে চলে গেছে।

.

কুড়ি

অ্যান্টনি ডিমার্কো। দারুণ প্রশংসনীয় চেহারা। সত্যি অ্যানির কথা একেবারে সঠিক। তার স্বামী সুপুরুষ। রোমানদের মতো মুখের গঠন। কুচকুচে কালো দুটি টানা চোখ। মাথায়

ঝাঁকড়ানো চুল। বয়স চল্লিশ। দীর্ঘকায় খেলোয়াড় সুলভ আকৃতি। অস্থির পশুর মতো সবসময় ছটফট করছে।

মনোরম গলা তার আপনাকে এক গ্লাস ড্রিঙ্ক বানিয়ে দিই ডাক্তার।

জুড মন্ত্র মুগ্ধ অর্থাৎ প্রয়োজন নেই।

বই পত্র ঠাসা লাইব্রেরি ঘরে ওরা পাঁচজন। জুড, ডিমার্কো, অ্যাঞ্জেলি আর সে দুই ভাই–রকি ও নিক ভ্যাকাররা।

ডিমার্কো জুডকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু আপনাকে ধরে আনার জন্য আমি দুঃখিত। কিছু জিজ্ঞাসা ছিল–আচ্ছা, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, ডাঃ স্টিভেন্স?

জুড অবাক হবার ভান করলেন–কে বলুন তো।

–গত তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছবার ও আপনার সঙ্গে দেখা করেছে। জুড ভুরু কোঁচকালেন ডিমার্কো পদবীওয়ালা কেউ তো–

–তাহলে সম্ভবত ও বিয়ের আগের পদবী আপনাকে জানিয়েছে, ব্লেক, অ্যানি ব্লেক।

–অ্যানি ব্লেক! ভ্যাকোরা ভাইয়েরা আরও কাছে এগিয়ে এল।

–না। ধমক দিয়ে উঠল ডিমার্কো। তারপর জুডের দিকে ফিরে তাকাল ডাক্তার, একটা কথা আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি। আমি বাচ্চাদের খেলা পছন্দ করি না। শেষে অপ্রিয় যদি কিছু করে বসি, তাহলে আমাকে দোষ দেবেন না।

–আপনার যা প্রাণে চায় তাই করতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার মুখ থেকে শোনার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে অ্যানি ব্লেক আপনার স্ত্রী?

অ্যাঞ্জেলি বলল কথাটা সত্যি হতে পারে।

ডিমার্কো তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলুন, গত তিন সপ্তাহ ও কী নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছে।

জুড বললেন–সেটা বলার মতো কিছু নয়। আসলে উনি নিজের সমস্যার কথাটাই আমার কাছে প্রকাশ করেননি।

ডিমার্কো এক দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল–আমি কিন্তু আরও কিছু শোনার আশা করেছিলাম।

–আমি শুধু এটুকুই জানতাম, উনি কোনো ব্যাপারে অসুখী। কিন্তু সেটা নিয়ে উনি আলোচনা করতে চাইতেন না।

–আপনার অফিসে গিয়ে ও যা যা বলেছে, তার প্রত্যেকটি কথার রেকর্ড আমার কাছে আছে। আমার পরিচয় কী দিয়েছে ও?

–আপনার একটা নিজস্ব কারখানা আছে এটুকু শুনেছি।

–আপনার চারিত্রিক বিশ্লেষণ তথ্য আমি ভালোভাবে শুনেছি। তাতে আমার মনে হল রোগীর কোনো কিছুই আপনার কাছে অজানা থাকে না।

–ওটা আমার চিকিৎসার অন্যতম পদ্ধতি। কিন্তু মিসেস ডিমার্কের ক্ষেত্রে আমি একেবারে হেরে গেছি। এই কারণেই ওকে আমি ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম।

–কিন্তু শেষ অব্দি ছাড়া হয়নি।

–তার প্রয়োজনও হয়নি। গত শুক্রবার উনি আমায় জানিয়ে গেলেন যে, আপনারা ইউরোপ চলে যাচ্ছেন।

–কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যানি মত পাল্টে ছিল। আমার সঙ্গে ইউরোপ যেতেও রাজী হয়নি। বলতে পারেন কেন?

জুড এবার সত্যি অবাক–না!

–কারণটা স্বয়ং আপনি ডাক্তার।

–বুঝলাম না, খুলে বলুন।

–বোঝা কিন্তু উচিত ছিল। যাই হোক, গতরাতে অ্যানির সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। ও বলেছে, আমাকে বিয়ে করাটাই নাকি ওর ভুল হয়েছে। আমার ওপর ওর আদৌ আকর্ষণ নেই। সে জিনিসটা এখন চলে গেছে আপনার দিকে।

ডিমার্কের গলা ফিসফিসানির পর্যায়ে চলে এল আপনার অফিসে একান্তে বসে ও যা আচরণ করেছে, আমি আপনার মুখ থেকে সেগুলো শুনতে চাইছি।

–তেমন কিছুই উনি করেননি। আমাদের লাইনে অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন। প্রত্যেক রোগিনী কোনো একটা সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। সেই সময় প্রায় তারা সাইকিয়াট্রিস্টদের প্রেমে পড়ে যায়। অবশ্য এই ভুল ভাঙতে খুব একটা দেরী হয় না। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন উনি আমার কাছে যাতায়াত করছেন?

ডিমার্কো এক মুহূর্ত জুডের দিকে তাকাল। টেবিল থেকে কাগজ কাটার একটা ধারালো ছুরি নিল খবর আমার কাছে ঠিকই এসে যায় ডাক্তার। যাই হোক, আমার দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের গোপন খবরাখবর বাইরে পাচার করার অপরাধে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মতো ওকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু আমি অ্যান্টনি ডিমার্কো ওদের সর্বাধিনায়ক। আমার সিদ্ধান্ত হল যাকে অ্যানি গোপন খবরাখবর পাচার করেছে, তাকেই প্রথম পৃথিবী থেকে সরাব।

ডাক্তারের মনে হল একটা শীতল শিহরণ তার সমস্ত স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি বললেন–আপনি গোড়াতেই ভুল করছেন।

–না ডাক্তার, ভুলটা আমার নয়, ভুলটা অ্যানির। খাঁচায় বদ্ধ হিংস্র জন্তুর মতো পায়চারি শুরু করল ডিমার্কো, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, ও আমার থেকে আপনাকে যোগ্য বলে মনে করল কী করে? কী যোগ্যতা আছে আপনার? সারা বছর অফিস থেকে কত টাকা আয় করেন? তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার...এক লাখ? ওটা আমার হপ্তার রোজগার। বলুন আমাকে, কী দেখে আপনারা পরস্পরের দিকে মজে ছিলেন?

–আমার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কোনো প্রশ্ন নেই।

ডিমার্কোর চোখ ঝলসে গেছে ওর উপর কোনো আকর্ষণ নেই আপনার?

–আমি আগেই জানিয়েছি ওর সঙ্গে আমার চিকিৎসক রোগীর সম্পর্ক।

–বেশ ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি এই কথাটা নিজের মুখে জানাবেন। ডিমার্কোর ইঙ্গিতে ভ্যাকাররা ভাইয়েরা পাশের হল ঘরে চলে গেল।

–যতক্ষণ অ্যানি আমার সম্বন্ধে কিছু জানবে না, ততক্ষণ ওকে বাঁচার সুযোগ দেওয়া হবে। তাই ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার সঙ্গে ইউরোপ পাঠানোর দায়িত্ব আপনার।

একথা বলে বেরিয়ে গেল সে।

জুড অনুভব করলেন, তার গলা শুকিয়ে গেছে। ডিমার্কো যতই নিজেকে চালাক ভাবুক তার এই চালটা ধরতে ডাক্তারের একটুও অসুবিধা হয়নি। বেচারী অ্যানি, তিনি যাই করুন না কেন ওকে মরতে হবে। ডিমার্কো এখানে সে ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ইউরোপে

কোন সমস্যা নেই, ওখানে যে কোনো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি তিনি ওর স্বামীর আসল পরিচয়টা খুলে বলেন? তা হলে ডিমার্কো ওকে এখানেই হত্যা করবে অর্থাৎ কোনো দিকেই কোনো রাস্তা খোলা নেই। কেবল হত্যার স্থানটা নির্বাচন : করা ছাড়া।

অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে জুড যখন বাড়িতে ঢুকলেন তখন অ্যানি ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের জন্য অসম্ভব খুশী হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু অ্যাঞ্জেলির রিভলবার দেখে চমকে ওঠে।

স্বামীর আসল পরিচয় এখন ওর কাছে আর অজানা নয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে স্বামীর মুখোশটা খুলে গেছে। তুচ্ছ কয়েকটা কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাস ধরে অশান্তির আগুন দাউদাউ জ্বলেছে। সেদিনের স্মৃতি আজও জ্বল জ্বল করছে। মদ্যপ এক অভিনেতার জন্য নাটক মাঝ পথে ভন্ডুল হয়ে যায়। অনেক আগে বাড়িতে ফিরে আসে সে। লাইব্রেরি ঘরে তখন জোর সভা চলেছে। ওকে দেখে অ্যান্টনি হতভম্ব। তারা এগিয়ে এসে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। একজনের চিৎকার তার কানে ভেসে আসে। লোকটা বলছিল আমার মতে আজ রাতেই কারখানাটা ধ্বংস করতে হবে। বেজন্মাগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

আর কিছু অ্যানি শোনেনি। কথাগুলো বেখাপ্পা শুনিয়েছিল। সেই মুহূর্তে গুরুত্ব দেয়নি। এর কয়েক দিন বাদে আর একটা ঘটনা ঘটল। খেলার ছলে টেলিফোন লাইনের রিসিভারটা তুলতে গিয়ে অ্যান্টনির গলা শুনতে পেল।

–টরেন্টার একটা জাহাজ আজ রাতে আমরা দখল করছি। তুমি রক্ষীকে দেখবে। সে আমাদের দলের নয়।

কাঁপতে কাঁপতে সে ফোন নামিয়ে রাখে কী সর্বনাশ? জাহাজ দখল? রক্ষীকে দেখা? পরক্ষণেই ভাবে এগুলো হয়তো ব্যবসায়িক সংকেত। অ্যান্টনিকে জিজ্ঞাসা করলেই পুরো ব্যাপারটা জানা যাবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে একটা বিপত্তি, ইস্পাতের দেওয়াল যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ওকে কঠোর কঠিন ভাষায় সাবধান করে দেওয়া হল। বলা হয়েছিল, সংসার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে সে যেন মাথা না ঘামায়। এরপর কথা কাটাকাটি অবশ্যম্ভাবী, হলও তাই। পরের দিন আবার মধুর মিলন। দামী একটা নেকলেস গলায় পরিয়ে ওর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হল। এরপর কি আর রাগ করে থাকা সম্ভব?

এর মাস খানেক বাদে তৃতীয় ঘটনা। দরজার আওয়াজে ভোর চারটের সময় ঘুম। ভেঙে গিয়েছিল অ্যানির। কী হয়েছে জানতে, নিঃশব্দে নীচে নেমে আসে ও। লাইব্রেরী, ঘরে তখন তর্কযুদ্ধ চলেছে। অ্যান্টনির সঙ্গে জনাছয়েক অপরিচিত লোককে দেখে ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। দোরগোড়া থেকে আবার ফিরে আসে। পরের দিন প্রাতরাশের সময় কথায় কথায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে তারপর, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?

অ্যান্টনি হাসতে হাসতে জবাব দেয়–দারুণ। রাত দশটায় শুয়েছি। আর সকালে চোখ খুললাম। এক ঘুমে রাত কাবার।

অ্যানি বুঝতে পেরেছিল এবার সত্যি ও বিপদে পড়েছে। বিপদটা কী, অথবা কোথা। থেকে আসতে পারে, সে সম্পর্কে ওর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে এটা ওর কাছে জলের মতো পরিষ্কার, অ্যান্টনি কোনো একটা বিশেষ ব্যাপারের জন্য মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এমন কী গুরুত্বপূর্ণ যার জন্য মাঝরাত্তিরে গুণ্ডা শ্রেণীর লোজনদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হবে? ওকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। উত্তর মিলবে না। কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়?

ঠিক সেই সময় ক্লাবের সান্ধ্যভোজন আসরে মনোবিজ্ঞানী জুড স্টিভেন্সের নামটা ওর কানে আসে। বন্ধুদের মুখে লোকটার প্রশংসা শুনতে শুনতে ও শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে। কৌতূহলের খাতিরে চলে যায় ডাক্তারের চেম্বারে। কয়েকদিন ধরে চলে আলোচনা। মনের বন্ধ দুয়ারগুলো ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করে। কিন্তু আসল সমস্যাটা সেখানেও খুলে বলা গেল না। উল্টে যেটা হল সেটা আরও শোচনীয়। ডাঃ স্টিভেন্সের গভীর প্রেমে পড়তে শুরু করল অ্যানি। যদিও ভালো করে জানত অ্যান্টনির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

মাত্র ছমাসের দাম্পত্য জীবনের পর একজনকে ও ভালোই বা বাসলে কীভাবে? ছিঃ, সব থেকে ভালো হয় লোকটার সাথে যদি দেখা করা বন্ধ করে দেওয়া যায়।

এরপর থেকে শুরু হয় ধারাবাহিক ঘটনা। ক্যারল রবার্টস খুন হয়। জুড গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরই উপস্থিতিতে মুডি নামে একজন বেসরকারি গোয়েন্দার মৃতদেহ এমন একটা অফিস বাড়ি থেকে পাওয়া গেল, যে বাড়িটার নাম অ্যানি আগে থেকেই জানত।

অ্যান্টনির টেবিলে নামটা ছাপা প্যাডে ও দেখেছে।

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল ওর স্বামী খুনের বিষয়ে কিছু জানে না। কিন্তু গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অ্যান্টনি শোবার ঘরে এসে সরাসরি প্রশ্ন করেছে জুড সম্পর্কে। তার মুখ দেখে বোঝা গেছে, এবার ভয়ঙ্কর একটা আঘাত আসতে চলেছে ডাঃ জুডের জীবনে। এমন কী জুড হয়তো খুন হয়ে যাবে। নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ে অ্যানি ভেবেছে। আর একটা ব্যাপারে সে মারাত্মক ভুল করে। জুডের দুর্বলতার কথা সোজাসুজি জানিয়ে দেয় অ্যান্টনিকে। এমন কী বলে, ইউরোপ যেতেও সে পারবে না।

সেই জুড বাড়িতে এসেছেন। একমাত্র ওরই কারণে তার জীবন আজ বিপন্ন।

দড়াম করে শোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। অ্যান্টনি ঘরে ঢুকল।

–তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

হলুদ রঙের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে মাথার চুলগুলো ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে ঘরে ঢুকে অ্যানি বলল–কী খবর ডাঃ স্টিভেন্স? অ্যান্টনি এই মাত্র খবর দিল আপনি এসেছেন।

জুড বুঝলেন, ও সব জেনে গেছে। কিন্তু এখন তার কিছুই করণীয় নেই। হয়তো মৃত্যুটাকে তিনি কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করে বললেন–আপনি ইউরোপ যাবেন না শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

অ্যানিকে মনে হল, সে জুডের কথা মন দিয়ে শুনছে। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর চাপা গলায় বলল–আমি দুঃখিত।

জুড বললেন–আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত।

অ্যানি জুডের চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল–আর তা যদি না করি। যদি এখান। থেকে চলে যাই তাহলে?

–কক্ষনো ও কাজ করতে যাবেন না মিসেস ডিমার্কো। আপনার স্বামীর ধারণা আপনি আমার ওপর দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

অ্যানি কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে, ডাক্তার বললেন–আমি তাকে বুঝিয়েছি এটা আমার প্রায় সব রোগিনীর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। অনেক সময় আবেগের তাড়নায় তারা এসব কাজ করেন।

অ্যানি এই শব্দগুলোর আসল মানে বুঝতে পেরেছে জানি, আমিও খুব বোকার মতো কাজ করেছি আপনার কাছে গিয়েযাক আমি ভেবে দেখব, হয়তো ইউরোপ বেড়িয়ে আসতে পারলে আমারও উপকার হবে।

জুড একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জানলার বাইরে ঘন গাছে ঘেরা জঙ্গলের দিকে। তার চোখ পড়ল। আনি কি প্রায় ওখানে ঘুরে বেড়ায়? তাহলে ওখান দিয়ে বাইরে যাবার কোনো গোপন সড়ক পথ আছে কি? অ্যানি হয়তো সেই সড়কের সন্ধান জানে।

গলার স্বর খাদে এনে তিনি ডাকলেন–আনি।

কথা শেষ হয়েছে আপনাদের? জুড তাকালেন। ডিমার্কো ঘরে ঢুকেছে। পেছনে অ্যাঞ্জেলি, আর দুই ভ্যাকারো ভাই।

অ্যানি স্বামীর দিকে তাকাল–হ্যাঁ, ডাঃ স্টিভেন্স আমাকে বলছেন, তোমার সঙ্গে ইউরোপ যেতে। আমি ওনার পরামর্শ মেনে নিচ্ছি।

ডিমার্কোর মুখে হাসি–আপনার ওপর আমার আগেই আস্থা ছিল ডাক্তার। স্ত্রীর দিকে ফিরে –তাহলে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব। তুমি বরং ওপরে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও।

অ্যানি ইতস্তত করতে থাকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, জুডকেও এই শত্রুপুরীতে একা ফেলে কোথাও যেতে চাইছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে হল।

হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানি চলি ডাঃ স্টিভেন্স।

–আসুন।

স্ত্রীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ডিমার্কো হাসল বড়ো সুন্দর চেহারা তাই না ডাক্তার?

জুড বললেন–ওকে কি এর মধ্যে না জড়ালেই নয়? আপনার বিষয়ে কিছুই জানেন না উনি।

হাসিটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন চলুন, যাওয়া যাক এবার।

জুড অসহায়ের মতো চারদিকে তাকালেন। ভ্যাকাররা ভাইয়ের দুচোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। অ্যাঞ্জেলির একটা হাতে রিভলবার ধরা, পালানোর কোন পথ নেই।

ডিমার্কো তার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল–না। এখানে কিছু করব না। যা হবার বাইরে হবে। এখন এখোন।

সিঁড়ির মাথার জানলা দিয়ে অ্যানি দেখল ওরা জুডকে ঠেলতে ঠেলতে অ্যাঞ্জেলির গাড়িতে ঢোকাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে ও শিউরে উঠল। ছুটে গেল নিজের শোবার ঘরে। টেলিফোনটার কাছে।

–হ্যালো অপারেটর আমি পুলিশকে চাইছি। তাড়াতাড়ি, খুবই তাড়াতাড়ি। সহসা পেছন থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত ওর কাঁধটা চেপে ধরেছে। রিসিভার যন্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে নামিয়ে রাখল। চিৎকার করে ঘুরে তাকাল অ্যানি। দেখল, নিক ভ্যাকাররা অসভ্যের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

.

একুশ

সবে বিকেল চারটে। সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছে। ঠান্ডা পড়েছে। অ্যাঞ্জেলি হেড লাইট জ্বালিয়ে দিল। প্রায় এক ঘণ্টা এক নাগাড়ে তাকে গাড়ি চালাতে হয়েছে। তার পাশে রকি ভ্যাকারো, পেছনের সিটে জুডকে নিয়ে অ্যান্টনি ডিমার্কো।

প্রথম দিকে কোনো ভ্রাম্যমান পুলিশের গাড়ির প্রত্যাশায় জুড রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। পরে বুঝতে পারলেন, এ একটা দুরাশা। নির্জন গলি খুঁজি ধরে এগিয়ে চলেছে অ্যাঞ্জেলি। মরিস টাউনের সীমানা ছাড়িয়ে রুট দুশো ছয় ধরে আরও দক্ষিণে নিউজার্সির দিকে চলেছে তার গাড়ি। একটু পরে তুষার পড়তে শুরু হল।

ডিমার্কো বলল, আস্তে চালাও, অ্যাকসিডেন্ট বাঁধিয়ে বসোনা। জুডের দিকে ফিরে তাকাল, এই ভুলটা প্রায় সকলেই করে থাকে।

জুড পেশাদারী দৃষ্টিতে ডিমার্কোকে পর্যবেক্ষণ করলেন। লোকটা মনোরোগে ভুগছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের সম্বন্ধে একটা বিরাট ধারণা, অথচ এই ধারণার অন্তরালে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এসব মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। নৈতিকতার ধার ধারে না এরা। প্রয়োজন হলে হাসতে হাসতে খুন করে। যে ভাবে খুন করেছে জন হ্যানসেন আর ক্যারল রবার্টসকে।

হ্যানসেন অবশ্য তার ভুলের শিকার। অ্যাঞ্জেলি মারফত খবরটা জেনে সে জুডের অফিসে চড়াও হয়েছিল। বেচারী ক্যারল, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও সে প্রয়োজনীয় টেপগুলি দিতে পারেনি। আসলে অ্যানির প্রকৃত পদবী জানত না বলেই তাকে এমন কাজ করতে হয়েছে। ডিমার্কো ঠান্ডা মাথায় একটু সাহায্য করলে ক্যারল

ওই টেপগুলো অনায়াসে খুঁজে পেত। হয়তো রেগে গেলে ডিমার্কো মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাই ক্যারলকে জীবন দিতে হয়।

এই ডিমার্কোই হল সেই লোক, যে জুডকে গাড়ি চাপা দিতে চেয়েছিল। অ্যাঞ্জেলির সঙ্গে তার অফিসে চড়াও হয় তাকে খুন করতে। সেই সময় ওরা দরজা না ভাঙাতে জুড় অবাক হয়েছিলেন কিন্তু আসল কারণটা অন্য। তখন ওদের ধারণা ছিল, ম্যাকগ্রেভি তাকে ফাঁসিয়ে দেবেই। তাই ঘটনাটা তারা সাজাতে চেয়েছিল আত্মহত্যার মতো। এতে পুলিশি তদন্ত বেশি দূর এগোত না। অনায়াসে তারা সন্দেহমুক্ত হতে পারত।

এবং মুডি। আহা, নিরীহ এক মানুষ। জুডের দোষেই তাকে প্রাণ হারাতে হল। অ্যাঞ্জেলিকে তিনি নিজেই তার খবরটা দিয়েছিলেন।

জুড বললেন–অ্যানির কী ব্যবস্থা হল?

ডিমার্কো ভুরু কুঁচকে তাকাল–ওটা নিয়ে ভাববেন না। ওর ভাবনা আমার। ভুলটা আমার। পরিবারের বাইরে কাউকে বিয়ে করাও আমার উচিত হয়নি। বাইরের লোক এসব বুঝতে পারে না। এটাই আমার জীবনে মস্ত বড় ভুল।

ফাঁকা জমির পাশ দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে। দূরে দু-একটা কারখানার ছাউনি। এছাড়া জন মানবের চিহ্ন নেই।

অ্যাঞ্জেলি বলল–আমরা প্রায় পৌঁছে গেলাম।

ডিমার্কো বলল–তোমার কাজগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে। একেবারে নিখুঁত। যতই তোমাকে দেখছি ততই অবাক হচ্ছি আমি।

–ব্যাপারটা সম্পূর্ণ থিতিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমায় কোথাও লুকিয়ে রাখব। বলো কোথায় যাবে?

–আমার ইচ্ছে ফ্লোরিডাতে থাকা।

–কোনো সমস্যা নেই। ওখানে আমার সংগঠনের সঙ্গে থাকতে পারো। ডানদিকে একটা কারখানা দেখা গেল। চিমনি দিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। অ্যাঞ্জেলি এবার যে রাস্তায় ঢুকল সেটা কারখানার দিকে চলে গেছে। বিশাল একটা পাঁচিলের সামনে এসে সে থামল। দরজা বন্ধ। হর্নের শব্দ শুনে বর্ষাতি আর টুপি পরা একটা লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। ডিমার্কোকে অভিবাদন জানাল। ফটক খুলে দিল। অ্যাঞ্জেলি গাড়ি নিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ল।

.

তরুণ পুলিশ অফিসার ছুটতে ছুটতে দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল। এত জন অচেনা লোক কেন এসেছে?

ম্যাকগ্রেভি প্রশ্ন করল–কী ব্যাপার?

–নিউজার্সি থেকে একটা খবর এসেছে স্যার। ব্যাপারটা জরুরী কিনা জানি না, তবে আপনি বলেছিলেন অস্বাভাবিক কিছু শুনলেই খবর দিতে, তাই।

–যা বলার চটপট বলল।

–একটু আগে একজন মহিলা আমাদের হেড কোয়াটারে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরী। তারপর লাইনটা কেটে গেল। অপারেটর বলছে, উনি আর ফোন করেননি।

–কোথাকার ফোন ছিল ওটা?

–ওটা টপ্পার নামে একটা শহরের।

–নম্বরটা জানা নেই?

–না, হঠাৎ ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

–আশ্চর্য।

বারটেলি বললেন,–কোনো বুড়ির বেড়াল-টেড়াল হারিয়েছে মনে হচ্ছে।

টেলিফোন বাজল। ম্যাকগ্রেভি রিসিভার তুলে লেফটেনান্ট ম্যাকগ্রেভি বলছি।

ঘরের সকলের দৃষ্টির সামনে চোয়াল ক্রমশ কঠিন ঠিক আছে। আমি না আসা পর্যন্ত ওদের কিছু করতে বারণ করুন। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। আমাদের হাইওয়ের পুলিশ বাহিনী অ্যাঞ্জেলির গাড়িকে রুট দুশো ছয় ধরে মিডলস্টোনের দিকে যেতে দেখেছে।

একজনের প্রশ্ন–ওরা পিছু নিয়েছে?

ম্যাকগ্রেভি–ওরা উল্টোদিক দিয়ে আসছিল, ঘুরে আসার আগেই গাড়িটা উধাও হয়ে গেছে। তবে জায়গাটা আমি চিনি। ওখানে কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে।

এফ বি আই সদস্যের কাছে জানতে চাইল মাকগ্রেভি-ফ্যাক্টরির মালিকদের নামগুলো এখুনি আমার চাই।

সে বলল–ঠিক আছে, আমি এখনই দিচ্ছি।

–আমি এগোচ্ছি। ওগুলো পেলে আমাকে ওয়ারলেসে জানিয়ে দেবেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাকগ্রেভি।

.

উঁচু উঁচু কয়েকটা ইটের চিমনি পেরিয়ে বেল্ট জড়ানো বিশাল কয়েকটা পাইপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। প্রথমে অ্যাঞ্জেলি নামল। তারপর রকি। রকির হাতে উদ্যত রিভলবার। এক হাতে পেছনের দরজাটা খুলে ধরল সে–নামুন ডাক্তার।

জুড আস্তে আস্তে বাইরে এলেন। পেছনে ডিমার্কো। বাইরে হাওয়ার ঝাঁপটা চলেছে। আট গজ দূরে একটা পাইপ বিকট গর্জন তুলে সব কিছুকে ভেতরে টেনে নিচ্ছে। শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না।

ডিমার্কো গলা চড়িয়ে বোঝাতে লাগল–এটা হচ্ছে এ দেশের অন্যতম বড়ো পাইপ লাইন। এর কাজ কী, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আসুন ডাক্তার কাছে গিয়ে দেখা যাক। এমন সুন্দর দৃশ্য দেখার সুযোগ খুব একটা আসে না।

প্রথমে অ্যাঞ্জেলি পেছনে ডিমার্কো। পাশাপাশি জুড। সব শেষে রকি। তারা সকলে পাইপ লাইনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডিমার্কো গর্বের সঙ্গে বলতে থাকে–এই কারখানা থেকে বছরে পাঁচ মিলিয়ন ডলার আয় হয়। সবটাই অটোমেটিক। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় চলে।

হাওয়ার গর্জন বেড়ে উঠেছে। জুড ডিমার্কের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরে শিউরে উঠলেন। পাইপের একশো গজ দূর দিয়ে বেল্টের সাহায্যে বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি চলে আসছে। বিশাল একটা মেশিনের সামনে আসছে তারা। চাকার মতো ঘুরছে বেল্টগুলো। এর পেছনে পাইপের বিশাল গহ্বর। কাঠের গুঁড়িগুলোকে মেশিনের ব্লেড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। হাওয়ার প্রচণ্ড টানে সেগুলো ঢুকে যাচ্ছে ওই গর্তের ভেতর।

ডিমার্কো বোঝাতে থাকে কাঠের গুঁড়িগুলো যতই বড়ো হোক ক্ষতি নেই। এই মেশিন সেটাকে এমনভাবে টুকরো করে দেবে, যাতে সেগুলো পাইপের মুখে একটুও না আটকায়।

পকেট থেকে রিভলবার বের করে সে হাঁক দেয়–অ্যাঞ্জেলি।

অ্যাঞ্জেলি ঘুরে তাকায়।

–অ্যাঞ্জেলি তোমার ফ্লোরিডা যাত্রা শুভ হোক। রিভলবার গর্জন করে। গোলাকার লাল দাগ ফুটে ওঠে অ্যাঞ্জেলির শার্টের সামনে। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আরও একবার ট্রিগারে চাপ দেয় ডিমার্কো। এবার সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে তার দেহটা। ইঙ্গিত পেয়ে রকি তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পাইপের কাছে এগিয়ে যায়।

–জুডের দিকে ফিরে ডিমার্কো–ওটা একটা আস্ত গাধা, মাথা মোটা। দেশের সমস্ত পুলিশ আজ ওকে খুঁজছে। ওকে পাওয়া মানে আমার বারোটা।

এরপর যে ঘটনা ঘটল, তা ঠান্ডা মাথার খুনের থেকেও ভয়াবহ। পাইপের কাছে। গিয়ে রকি অ্যাঞ্জেলিকে ভেতরের দিকে ছুঁড়ে দিল। হাওয়ার প্রচণ্ড টান নিমেষের মধ্যে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। জুড শিউরে উঠলেন। কোনোরকমে টাল সামলে নিলেন। রকি এবার ভাম্ব বের মুখে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোহার পাত এসে পাইপের মুখটাকে ঢেকে দিল। চারপাশে নেমে এল কবরখানার নীরবতা।

হাতের রিভলবারটা তাক করে মিটিমিটি হাসতে থাকল ডিমার্কো আপনার ক্ষেত্রে আমি শুধু এটাই ব্যবহার করব, যাতে অ্যানির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার আর একটু বাড়তি সময় পান।

জুড মরিয়া হয়ে জবাব দিলেন–কাউকে না কাউকে তো ভাবতেই হবে। ওঁর ভাগ্য খুবই খারাপ, জীবনে সত্যিকার পুরুষের সাহচর্য পেলেন না।

ডিমার্কো শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। বোঝা গেল, এই বক্তব্যটা সে বুঝতে পারেনি।

জুড চিৎকার করে উঠলেন–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। হাতে বন্দুক বা ছুরি না থাকলে–আপনি মেয়েছেলের সামিল। পুরুষত্ব যার আছে সে কখনও একটা নিরস্ত্র লোককে এই ভাবে ভয় দেখাবে না।

ডিমার্কোর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। রিভলবারটা দূরে ছুঁড়ে দিল সে। রকিকে হাতের ইশারাতে পিছিয়ে যেতে বলল। বলল–ঠিক আছে। খালি হাতেই আপনাকে আমি খুন করব।

ডিমার্কো এগিয়ে আসছে। জুড পিছোতে শুরু করলেন। জুড জানেন, বিনা অস্ত্রের লড়াইতেও তিনি ডিমার্কোর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। এক্ষেত্রে বাঁচবার একমাত্র পথ তার পৌরুষ সম্পর্কে কটাক্ষ করা। তিনি আবার বললেন আপনার আসল পরিচয় আমি জানি। আপনি একজন সমকামী।

রকি ছুটে গিয়ে রিভলবারটা কুড়িয়ে আনল। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বলে চিফ, আমি একে শেষ করে দিচ্ছি।

ডিমার্কো গর্জন করে ওঠে–থামো।

ওরা দুজন চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে। ভিজে কাঠের গুঁড়োতে জুডের পা পিছলে গেল। ডিমার্কো বুনো ষাঁড়ের মতো তার দিকে ছুটে এল। জুডের চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুষির আঘাত। জুড মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সেই অবস্থাতেই একটা লাথি চালিয়ে দিলেন। সেটা সরাসরি ডিমার্কোর মুখে লাগল। থমকে পিছিয়ে দাঁড়াল ডিমার্কো। দ্বিগুণ জোরে। ছুটে এসে একের পর এক ঘুষি চালাতে লাগল ডাক্তারের পেটে। যন্ত্রণায় ডাক্তার ছটফট করতে থাকলেন।

হো হো করে হেসে ওঠে ডিমার্কো কষ্ট হচ্ছে ডাক্তার? এককালে আমি একজন বক্সার ছিলাম। প্রথমে আপনার কিডনির ব্যবস্থাটা করে ফেলি। তারপর মাথাটা দেখব। ওই দুটো চোখ আমার চাই। এখন মনে হচ্ছে না, গুলি খেলেই বোধহয় ভালো হত। পাগলের মতো ঘুষি চালাতে লাগল সে।

জুড আর্তনাদ করে উঠলেন–ডিমার্কো।

একলাফে ডাক্তারের পেটের উপর উঠে বসে ডিমার্কো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল–খালি হাতে, হ্যাঁ, খালি হাতে আপনার চোখ দুটো উপড়ে আনব।

এবার জুডের ঠিক চোখের ওপর একটা সজোর ঘুষির আঘাত

***

রুট দুশো ছয়। বেডমিনস্টার ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে পুলিশের গাড়ি। রেডিওতে শব্দ শোনা গেল–কোড তিন, নিউইয়র্ক সাতাশ নম্বর ইউনিট বলছি। নিউইয়র্ক সাতাশ নম্বর ইউনিট।

ম্যাকগ্রেভি মাইক্রোফোন তুলে–ইউনিট সাতাশ নম্বর কথা বলুন।

ক্যাপ্টেন বারটেলির উত্তেজিত গলা–আমরা কারখানাটার সন্ধান পেয়েছি ম্যাক। ওটার নাম নিউজার্সি পাইপ লাইন কোম্পানি। মিডলস্টোনের দুমাইল দক্ষিণে। এটা চালায় ফাইভ স্টার করপোরেশন নামে একটা সংস্থা। এর মালিক অ্যান্টনি ডিমার্কো নামে একজন।

–ঠিক আছে আমরা এগোচ্ছি।

–আপনারা ওখান থেকে কত দূরে?

–দশ মাইল, ছাড়ছি।

ম্যাকগ্রেভি রেডিও বন্ধ করল। সাইরেনের সুইচ টিপে দিল। তারপর দ্বিগুণ চাপ দিল অ্যাক্সিলেটরে।

***

চোখের মধ্যে কয়েকটা রং-বেরঙের চাকা ক্রমশ চক্কর মারছে। চেষ্টা করেও তিনি তাকাতে পারছিলেন না। বুকের ওপর বিরাট একটা পাহাড়। তারপর বললেন–দেখলেন। আমি বলছি, আমি বলছি কেবল মানুষের গায়েই আপনি হাত চালাতে পারেন। ঘুষি মারা বন্ধ হল। চলে গেল বুকের বোঝ। মনে হল, কে যেন কলার খামচে তাকে মাটি থেকে টেনে তুলেছে।

–আপনি মারাই গেছেন, ডাক্তার, খালি হাতে আপনাকে আমি শেষ করে দিয়েছি। জুড পিছিয়ে গেলেন–আপনি জন্তুর অধম। আপনাকে পাগলা গারদে রাখা উচিত।

–চুপ করুন।

–যা বলেছি, তাতে কোনো ভুল নেই। আপনার মাথা অপরিণত। আপনি একেবারে নিরেট।

ডিমার্কো ছুটে এসে গলা চেপে ধরল–আপনার ঘাড় আমি মটকে দেব।

হঠাৎ জুড অনুভব করলেন, তিনি পাইপ লাইনের ভালবের কাছে এসে পড়েছেন। প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে। বিশাল দুটি হাতের থাবা ক্রমশ তার গলায় চেপে বসেছে। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, বাঁচবার কোনো আশা নেই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এসে ভর করল তার দেহের ওপর। মরিয়া হয়ে হাত বাড়িয়ে ভালবের প্যাঁচটা খুললেন। সজোর লাথি চালালেন ডিমার্কোর পেটে। হাওয়ার ঝাঁপটায় দুজনেই পড়ে গেলেন। আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি ভালবের মুখটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে

ফেলেছেন। হঠাৎ একটা জান্তব চিৎকার তার কানে এল। পাশে কাউকে না দেখে প্যাঁচটাকে ঘুরিয়ে দিলেন। পাই তখন ডিমার্কোকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে।

টলতে টলতে জুড উঠে দাঁড়ালেন। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই। নিক এখনও গুলি চালাচ্ছে না কেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ তার কানে এল। বেশ কয়েক জোড়া বুটের আওয়াজ। তার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। একটু বাদে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল কে যেন। ম্যাকগ্রেভির গলা তিনি শুনতে পেলেন সর্বনাশ, নিজের মুখটা একবার দেখুন।

গালের কাছটা ভেজা ভেজা লাগছে। রক্ত না চোখের জল তার জানা নেই। অনেক কষ্টে চোখের এককোণের পাতা ফাঁক করে ম্যাকগ্রেভিকে বললেন–অ্যানি, ডিমার্কোর স্ত্রী এখন বাড়িতে আছে। ওকে সাহায্য করুন।

ম্যাকগ্রেভি পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। জুডের সামনে একজন উপুড় হয়ে। মাটিতে পড়ে আছে। লোকটা কি ভ্যাকাররা।, এতক্ষণে তার জিত হয়েছে। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এ কেমন ধরনের জয়? তিনি একজন চিকিৎসক, তার পক্ষে কাউকে হত্যা করা সম্ভব? আত্মরক্ষার খাতিরে? সারাজীবন এই বেদনা তাকে কুরে। কুরে খাবে।

ম্যাকগ্রেভি সামনে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তার আচরণে। শান্ত গলায় বলল–পুলিশের গাড়ি ওঁকে আনতে রওনা হয়েছে ডাক্তার স্টিভেন্স। ঠিক আছে?

জুড কৃতজ্ঞ চিত্তে ঘাড় নাড়লেন। ম্যাকগ্রেভি জুডের হাতে হাত রাখলেন। তারা দুজন তখন গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন।

জুড চোখ বন্ধ করলেন। অ্যানির বিষণ্ণ মুখখানা ভেসে উঠল। ভবিষ্যৎ জীবনের ধূসর ছায়া? না, এই জীবনে আর কোনো নারীকে তিনি স্মরণ করবেন না। চোখ বন্ধ করলেন। পঁচিশে ডিসেম্বর, এলিজাবেথ এবং তার অজাত পুত্র–মনটা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল তার।